Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো?

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার শিমু

রোলঃ ২১৬০২০১৬১

৭ই জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো?

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আয়েশা আক্তার শিমু

রোলঃ ২১৬০২০১৬১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো?" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আয়েশা আক্তার শিমু, আইডিঃ২১৬০২০১৬১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিবো?” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আয়েশা আক্তার শিমু

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৭ই জুন, ২০২৪ ইং

আয়েশা আক্তার শিমু

আইডিঃ ২১৬০২০১৬১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রশংসা শুধুই আল্লাহ তা'আলার তাঁর কাছেই আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। কুপ্রবৃত্তি এবং মন্দ কর্মের অকল্যাণ থেকে আমরা পানাহ চাই আল্লাহর কাছেই। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথ দেখান না কেউ তাকে পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। নেই তাঁর কোন অংশীদার। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল।

বনি আদমের মৃত্যুর পর তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তবে তিন ধরনের আমল ছাড়া -

১. সাদাকায়ে জারিয়া
২. উত্তম জ্ঞান যার মাধ্যমে মানবজাতি উপকৃত হয়।
৩. উত্তম সন্তান যে মৃত্যুর পর তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে
(মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

ইতিহাসের পরতে পরতে প্রত্যেক সমাজ ও সংস্কৃতিতে পিতা-মাতা ও সন্তানদের মাঝে এক ধরনের জেনারেশন গ্যাপ পরিলক্ষিত হয়ে আসছে, কিশোর বয়সের যা ব্যাপক আকার ধারণ করে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নাগরিকদের উত্তম রূপে তৈরি করে তাদের সুখ শান্তি নিশ্চিত করা অভিভাবকদের জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জস্বরূপ। এই চ্যালেঞ্জের সফলতা মূলত নির্ভর করে সন্তানরা কত আদর্শিক উপায়ে লালিত পালিত হচ্ছে তার উপর। যে সকল সমাজ এই সন্তানদের উত্তমরূপে লালন পালনের দায়িত্ব কে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করেছে, তারা বহু গুণ এগিয়ে থাকে তাদের চেয়ে, যারা এই দায়িত্ব কে মামুলি মনে করে এবং খামখেয়ালিপনার মাধ্যমে পালন করে।

মানব জীবনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট। ইসলাম তরুণ সমাজকে সর্বোৎকৃষ্ট মানবিক মূল্যবোধ এবং স্পষ্ট নীতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভূমিকার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। সন্তানদের যথাযথভাবে লালন-পালনের জন্য ইসলাম পিতা-মাতার উপর বিশেষভাবে জোর প্রদান করে। যে পিতা মাতার যত উত্তম উপায়ে সন্তান লালন পালন করতে পারে তার প্রতিদান ততই বেশি।

সন্তানদের লালন পালন একইসঙ্গে আনন্দদায়ক উদ্যমী ও দুঃসাহসিক কাজ হতে পারে, যদি পিতা-মাতা এটিকে জীবনের অন্যতম অংশ মনে করেন এবং এই দায়িত্ব কে গুরুত্বের সাথে পালন করেন।

কোন শিশুই জন্মগতভাবে ধার্মিক হয়ে জন্মায় না। বাবা মা নামাজি হলেই বলা যায় না তাদের সন্তানও নামাজি হবেন। সন্তানরা হয় কাদামাটির মত। কাদামাটির স্বভাব হচ্ছে এটা নরম থাকা অবস্থায় যেমন খুশি আকার দেওয়া যায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বাতাস রোদ ইত্যাদির সংস্পর্শে সেটা এতই শক্ত হয়ে যায় যে তখন চাইলেও তাকে ভিন্ন কোন আকার দেওয়া যায় না। উল্টো জোর করে কোন আকার দিতে চাইলে সেটা ভেঙে যায়।

ইসলাম বলে শিশুরা জন্মায় ফিতরাতের উপর। সত্য গ্রহণের জন্য একটি নিষ্কলুষ হৃদয় নিয়ে ওরা জন্মায়। যেটা কিনা আবার বড় হতে হতে কলুষিত হয়ে যায় কলুষিত মানুষের সংস্পর্শে এসে। তাই ছোটবেলার সময় টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে আপনি আপনার সন্তানকে যেভাবে তারবিয়ত করবেন, তার জীবনের বড় একটা অংশই সেদিকে মোড় নেবে।

আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান নেককার হোক। নিজেরা অবহেলা, গাফিলতির কারণে খুব একটা নেককার না হতে পারলেও কমবেশি সবাই স্বপ্ন দেখি একটি পরহেজগার সন্তানের। আর ইসলাম এক্ষেত্রে সাজিয়ে দিয়েছে বেশ কিছু কর্মসূচি। কোরআন হাদিসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নেক সন্তান গড়ার পাথেয়।

তারবিয়াত কী?

তারবিয়াত হলো ইজ্জত-সম্মান, লাজুকতা, দয়া-মমতা, মানবিকতা, আত্মমর্যাদাবোধ, জুলুমের প্রতিরোধ, আল্লাহর জন্য ক্রোধ, ঈমানি আত্মমর্যাদাবোধ, সৎকাজে আদেশ দান, অসৎকাজে বাধা প্রদান, ব্যক্তিত্বের প্রভাব ইত্যাদি গুণের ওপর সন্তানদের গড়ে তোলা। বিভিন্ন উপায়ে আজকের পৃথিবীতে এই গুণগুলো ধ্বংস করার অপচেষ্টা চলছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, গণমাধ্যম, ফিল্ম, কার্টুন ও গেইমসের মাধ্যমে সুচিন্তিতভাবে লজ্জাশীলতাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। যার ফলে শিশুমনে কঠোরতা ও সহিংসতা জন্ম নিচ্ছে।

সন্তানদের গড়ে তোলার অর্থ হলো তাদেরকে চিন্তা-গবেষণার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। কীভাবে সে সঠিক প্রশ্ন করবে, মনের ভাব ব্যক্ত করবে, বিকৃত ও সঠিক জ্ঞানের মাঝে পার্থক্য করবে, হঠাৎ উদিত হওয়া বিভিন্ন চিন্তার কীভাবে যথাযথ খণ্ডন করবে, বিভিন্ন তথ্য কীভাবে যাচাই করবে, কীভাবে সে দ্বীনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টিকারী ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করবে, তাদের প্রতারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হবে ইত্যাদি বিষয় তাদের শিখিয়ে দেওয়া।

তারবিয়াত হলো নিজেকে আবিষ্কার করার পথে সন্তানদের সহযোগিতা করা। তাদের প্রতিভাকে সঠিক খাতে ব্যয় করা। সন্তানের সক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এমন লক্ষ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গ দেওয়া। জীবনের যে উদ্দেশ্যই সে বেছে নিক না কেন, যেন উম্মাহর মর্যাদার সুদীর্ঘ অধ্যায়ে সেও অংশগ্রহণ করে।

সন্তানদের এই বলে শিক্ষা দিন, “নিজের মতো হও। নিজেকে গ্রহণ করো। অন্যের ব্যক্তিত্বকে ধারণ করবে না। কাউকে যদি তুমি এমন কোনো কাজ করতে দেখো যা তুমি নিজে বাস্তবায়ন করতে পারো না, তখন নিজেকে ব্যর্থ ভাববে না। তোমার সাথে

খাপ খায় না এমন কোনোকিছুকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করবে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ব্যক্তিত্ব রয়েছে।”

মনে রাখবেন, এসব কথা ছাড়া আপনার সন্তান কখনোই পরিতৃপ্ত ও সুখী হবে না।

তারবিয়াত হলো সন্তানদের নিকট অস্তিত্ব বিষয়ক প্রশ্নগুলোর উত্তর স্পষ্ট করা। আমি কে? আমার সৃষ্টিকর্তা কে? আমার শেষ পরিণতি কী? আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? আমি মুসলিম কেন? কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ কী? সেগুলো কীভাবে সংরক্ষিত হয়ে এসেছে? নবি-এর নুবুওয়াতের দলীল কী? সন্তানদের দ্বীনের সমস্ত মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

তারবিয়াত মানে এই নয় যে, কোনো ২২ বছর বয়সী যুবক ১৮ বছর বিভিন্ন ও ইউনিভার্সিটিতে কাটিয়ে দেবে অথচ সে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর জানবে না। কীভাবে চিন্তা করতে হয় সে ব্যাপারে তার কোনো ধারণা থাকবে না। একটি শব্দ তাকে তার প্রশ্নের উত্তর দেয় তো অন্য আরেকটি শব্দ তাকে ঈমানহারা করে ছাড়ে। নিম্নমানের কোনো একটি লেখা কিংবা ছোট্ট একটি ভিডিয়ো ক্লিপ খুব সহজে তার ঈমান হরণ করে নেয়! সঠিক চিন্তা-ভাবনা, বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা বা বৈজ্ঞানিক কোনো পর্যালোচনা ছাড়া সে খুব সরলভাবে তর্ক জুড়ে দেয়। এরপর নিজেকে কখনো শিক্ষিত, কখনো ইঞ্জিনিয়ার, কখনো ডাক্তার এমনকি কখনো-বা প্রফেসর হিসেবে পরিচয় দেয়!

তারবিয়াত হলো ইসলামি ইতিহাসের প্রকৃত বীরদের সাথে সন্তানদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। উম্মাহর বীরত্বের ইতিহাস তাদেরকে জানানো। যাতে তারা বুঝতে পারে, তাদেরও গভীর শেকড় রয়েছে। তখন তারা ব্যভিচারী, মাদকাসক্ত কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার বিভ্রান্ত সেলিব্রিটিদের পোশাক-আশাক, ছোটোবড়ো চুল এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পরিবর্তে উম্মাহর পরিচয়ে গর্ববোধ করবে।

তারবিয়াত হলো সন্তানদের প্রতিটি কাজে এই প্রশ্ন করতে অভ্যস্ত করে তোলা যে, আমি এই কাজটি কেন করব? মনে রাখবেন এই একটি প্রশ্ন তাকে অন্ধ অনুকরণ করা থেকে রক্ষা করবে।

তারবিয়াত হলো অনুপ্রবেশ করা বিভিন্ন মতাদর্শ সম্পর্কে সন্তানদের মধ্যে সতর্কতা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। যাতে গণমাধ্যমগুলো মানসিকতা ও মূল্যবোধ পরিবর্তনের যে অপচেষ্টা চালাচ্ছে তারা তা খুব সহজেই ধরে ফেলতে সক্ষম হয়।

তারবিয়াত হলো সন্তানদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ তৈরি করে দেওয়া। সেটা দ্বীনি জ্ঞান হোক বা অন্যান্য জাগতিক জ্ঞান। তারা যেন বিভিন্ন বই ও সিরিজের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে রাখে।

তাদের বলুন, 'উপকারী যত জ্ঞান রয়েছে, তা জানতে আগ্রহী হও, বেশ পরিশ্রম করো।' এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস গেইমসে মগ্ন থাকা, অশ্লীল ভিডিয়োতে আসক্ত হওয়া এবং বিভিন্ন ইউটিউবারদের গুরুত্বহীন কথাবার্তা থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। যখন পড়াশোনায় তাদের মন ও মস্তিষ্ক পরিপূর্ণরূপে ব্যস্ত থাকবে তখন এসব অনর্থক বিষয় তাদের স্পর্শও করতে পারবে না, তাদের সে সুযোগও হবে না।

তারবিয়াত হলো যুগের প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের প্রতি সন্তানদের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। ফলে সে প্রভাব বিস্তারকারী একজন সফল মুসলিমে পরিণত হতে পারবে। টেকনোলজির ব্যবহার, অর্থ ব্যবস্থাপনা, আশ্বস্ত করতে পারা, নেতৃত্ব দেওয়া, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে তাকে দক্ষতা অর্জনে সহযোগিতা করতে হবে।

তারবিয়াত হলো সন্তানকে পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য শিখিয়ে দেওয়া। যেন সে ভাইয়ের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখে আর বোনের প্রতি হয় স্নেহশীল।

তারবিয়াত হলো সন্তানদের দৃঢ়তা শিক্ষা দেওয়া। যেকোনো ধরনের ফলাফল গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত করা। জীবনে দুঃখ-কষ্ট যা আসবে তার মোকাবিলা করা এবং খারাপ ফলাফল সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেওয়ার শিক্ষা দেওয়া। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, তারা এখানে প্রশান্তি কিংবা নাজ-নিয়ামাতে ডুবে থাকতে আসেনি। এই দুনিয়া প্রতিদান পাওয়ার স্থান নয়, বরং পরীক্ষার স্থান।

তারবিয়াত হলো সন্তানদের কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত করা। তাদের মাঝে কুরআন বুঝার সক্ষমতা এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করার যোগ্যতা তৈরি করা। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের ভেতর আরবির প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া যাবে।

তারবিয়াত হলো সন্তানদের এই শিক্ষা দেওয়া যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার বিধান অনুসারেই মুমিন তার জীবন পরিচালনা করবে। এই বিধান ছাড়া অন্য কোনো সংবিধানকে যেন তারা স্বীকার না করে। বিশেষ করে এই সময়ে তাদেরকে আরও বেশি সচেতন করতে হবে, যখন দ্বীন বলতে কেবল নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ কতিপয় অনুষ্ঠান পালনকে বুঝানো হচ্ছে, যখন সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারিত হচ্ছে জনগণের চাহিদা ও প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে।

তারবিয়াত হলো সন্তানের নিকট আল্লাহর একত্ববাদ, আল্লাহর সম্মান এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করা। এই ভালোবাসা যেন সমস্ত ভালোবাসাকে হার মানায়। তাওহীদকে দূষিত করে এমন সব বিষয় থেকে তারা যেন নিজেদের রক্ষা করে চলে।

তারবিয়াত হলো সন্তানের নিকট উম্মাহর পরিচয়কে বড়ো করে তোলা। যেন সে উম্মাহর বর্তমান অবস্থাকে গুরুত্বের সাথে দেখে। হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে ইতিবাচক কাজ করতে সক্ষম হয়।

তারবিয়াত হলো সন্তানদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। ভালোবাসা, আস্থা, গুরুত্ব ও সততার প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমেই এই সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। তাদের সকল সমস্যা মনোযোগ দিয়ে শোনার মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করতে হবে। এসব করা ছাড়া উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব।

তারবিয়াত হলো বয়সের প্রতিটি স্তরের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সন্তানদের পরিচিত করে তোলা। এই ক্ষেত্রে তাদের সাথে গল্প করা, খেলায় অংশ নেওয়া বা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে তাদের নিকট ব্যাপারটি খোলাসা করা যেতে পারে।

তারবিয়াত হলো ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে সন্তানদের সামনে যেসব জটিলতা বাধা হয়ে দাঁড়াবে সেগুলোর সমাধানে তাদেরকে সহযোগিতা করা। সেই সাথে তাদের শারীরিক রোগবালাইয়ের দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি।

তারবিয়াত হলো সন্তানদের আদেশ দেওয়ার পূর্বে নিজে ইসলামে অভ্যস্ত হওয়া, শারীআতের প্রতিটি আমল পালন করা। ধীরে ধীরে তাদের সামনে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিণত হওয়া।

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত, নবি বলেছেন,

أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ

“প্রথমে মানুষের অন্তরের গভীরে ‘আমানত’ অবতীর্ণ হয়। তার পর তারা তা কুরআন থেকে শেখে, তার পর সুন্নাহ থেকে শেখে।” [বুখারি, ৬৪৯৭]

আমানত কী? আমানত হলো, নিজের সাথে সততা। সন্তানের হৃদয়ে আপনি যদি এই আমানতকে পাকাপোক্ত করতে পারেন তখনই কেবল কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান তাদের কাজে আসবে। আর যদি তাদের ভেতর এর বীজ বুনতে সক্ষম না হন তা হলে কোনোকিছুই তাদের উপকার পৌঁছাবে না। নিফাকের স্রোতে ভেসে যাওয়া থেকে তাকে রক্ষা করা আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

সুইয়ান সাওরি (র).-কে তার মা বলেছিলেন : 'প্রিয় বৎস, ইলম অর্জন করতে থাকো। আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রিয় বৎস, যখন তুমি দশটি হাদীস লিখবে তখন নিজের দিকে তাকাবে। এগুলো তোমার হাঁটা-চলা, ধৈর্য ও গাম্ভীর্যে কোনো বৃদ্ধি ঘটিয়েছে কি না দেখবে। যদি দেখো তোমার কোনো পরিবর্তনই হয়নি, তা হলে জেনে নিয়ো, এই ইলম তোমার কেবল ক্ষতিই করেছে, কোনো উপকার করতে পারেনি।

এই মহীয়সী মা সন্তানকে এই কথা বলেননি, এমন কিছু করো যাতে গৌরবে আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। পাশের বাসার চাচাতো ভাইকে দেখো, তোমাকে কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। বরং তিনি বলেছিলেন, আমি চাই, তোমার ইলম যেন তোমার চরিত্রে প্রভাব ফেলে। মা তার সন্তানকে ইলমের আমানত শিখাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহ) ও ইমাম শাফিয়ি (রহ) ইয়াতীম অবস্থায় বেড়ে উঠেছিলেন। তাদের তারবিয়াতের সবটুকু দায়িত্ব তাদের মায়েরাই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তারাই তো হয়ে উঠেছিলেন, উম্মাহর ইলম ও আমলের নাবিক।

আপনিই এতসব খেয়াল রেখে তাদের যোগ্য করে গড়ে তোলার উপযুক্ত। কেননা তারা আপনারই সন্তান। শত স্কুল, ডে-কেয়ার, টিউটর আপনার বিকল্প হতে পারে না। অতএব ইসলাম যখন মাকে সম্মান দেয়, যখন তার পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত বলে ঘোষণা করে তখন এতে অবাক হবেন না। একজন মায়ের দায়িত্ব শুধু এটুকুই নয় যে,

তিনি সন্তান প্রসব করে সন্তানকে কেবল রক্ত, গোশত আর হাড়ে বড়ো করে তুলবেন। মায়ের দায়িত্ব ব্যাপক। ওপরে বর্ণিত সবগুলো বিষয়ই তাকে খেয়াল রাখতে হয়, যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে হয়। ইসলাম মায়ের যে বিশাল মর্যাদা দিয়েছে তার একটি অন্যতম কারণ হলো মায়ের এই মহৎ দায়িত্ব পালন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

‘ওহে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সীমালঙ্ঘন করো না।'-সূরা আনফাল : ২৭

সন্তান আমানত ও পরীক্ষাস্বরূপ

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রতি আমানতস্বরূপ। অন্যকথায়, সন্তানদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ পিতা-মাতার ওপর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি পিতা-মাতাকে নির্দেশনাও দিয়েছেন যথোপযুক্ত উপায়ে সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে। খুব স্বাভাবিকভবেই এই আমানতের খেয়ানত করার অর্থ হলো—আল্লাহর দেওয়া আমানতের খেয়ানত করা। আমরা যদি নিজেদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য ব্যয় করে সন্তান প্রতিপালনের কাজটি সম্পাদন করতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির আশা পোষণ করি, তবে সর্বাগ্রে সন্তান লালন-পালনের প্রকৃতি, এর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে সম্যক ধারণা লাভ করতে হবে।

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনের জন্য জীবনে কোন কোন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা জ্ঞানবান মুসলিম মাত্রই অনুধাবন করতে পারে। তবুও তাদের উপলব্ধিতে এই বিষয়টি থাকা উচিত সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য কেবল খাদ্য, বস্ত্র ও জাগতিক সামগ্রীই যথেষ্ট নয়; বরং নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও আদর্শিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের গড়ে তোলাও আবশ্যক। যাতে তারা সমাজের একজন ভালো মানুষ ও আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে।

আরেকজন নবাগত অপরিপক্ব মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচর্যা এবং তার উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই সন্তান প্রতিপালনের জন্য মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা প্রয়োজন । কারণ, প্রত্যেক অভিভাবককে

একই সঙ্গে একজন শিক্ষক, পরামর্শক ও আধ্যাত্মিক পথনির্দেশকের দায়িত্ব পালন করতে হয়।

পিতা-মাতাও মানুষ, প্রকৃতিগত কারণে তাঁদেরও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার কারণে কোনো পিতা-মাতাই সন্তান প্রতিপালনে শতভাগ সফল হতে পারে না। আর সন্তান প্রতিপালনের এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে কোনো পিতা-মাতাই বিচার দিবসে পাকড়াও হবে না। তথাপি পিতা-মাতাকে এই ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়া উচিত। কেননা, তাদের ভঙ্গুর কাঁধে অর্পিত হয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি প্রতিপালনের ভারী বোঝা।

পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর ভেতর আরেকটি ক্ষুদ্র পৃথিবী; যেখানে আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা অনুসারে দায়িত্ব পালন এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এখানে পারস্পরিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা, আপস, সম্মানসহ বিভিন্ন মানবিক বৈশিষ্ট্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে।

ব্যক্তি নয়; একটি সমাজ গড়ে উঠে পরিবারের ওপর ভিত্তি করে। নতুন শিশুর জন্মের সাথে সাথে একটি নতুন পারিবারিক ইউনিট গড়ে ওঠে। অভিভাবকের কর্তব্য হলো— নিজের সক্ষমতাকে পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে ব্যয় এবং এমন একটি পারিবারিক পরিবেশ তৈরি করা, যাতে সন্তানরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করতে পারে।

সন্তান প্রতিপালনের এই পথ অনেক উত্থান-পতন, অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ, যা অভিভাবক-সন্তান উভয়ের ব্যক্তিত্ব গঠনে ভূমিকা রাখে। সৎ ও আত্মসচেতন পিতা-মাতা নিজদের ওপর প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে কোনো প্রকার গড়িমসির আশ্রয় নেয় না। অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তারা দৃঢ় ও সুপরিকল্পিত উপায়ে

নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। সুষ্ঠু পরিকল্পনাহীন সন্তান প্রতিপালন অচেনা ভূখণ্ডে কোনো প্রকার ম্যাপ বা পথনির্দেশিকা ছাড়া ভ্রমণ করার নামান্তর।

পিতা-মাতা পরস্পরের পরিপূরক দক্ষতা ও স্বভাবের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, যা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। কাজ মায়ের জন্য সহজ, কিছু কাজ বাবার জন্য সহজ। সন্তান প্রতিপালনের পুরো কাজটি পিতা-মাতা উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাধিত হয়। পিতা-মাতা উভয়ের লক্ষ্য একই গন্তব্যের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য উভয়ের সমন্বিত পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সমন্বিত পরিকল্পনার অভাবে পরিবারে মতপার্থক্য ও সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে। 'যদি প্রস্তুত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন, তবে ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত হন।' আমাদের কার্যক্রম এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই প্রবাদটির যথার্থতা রয়েছে।

আমরা শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা করি, তারা যেন সন্তানদের পাঠদানের জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পেছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে। কিন্তু সন্তানকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার জন্য নিজদের সময় দেওয়ার কথা বেমালুম ভুলে যাই! সন্তান প্রতিপালনের সর্বোচ্চ ফলাফল লাভের জন্য এবং সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের জন্য সচেতন পিতা-মাতা নিজেদের সার্বিক ধ্যান-জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা এর পেছনে ব্যয় করে । কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনে তারা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় ।

তারা কোনো ভুল করবে না—এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আমরা সবাই ভুল করি, কিন্তু চিন্তাশীল অভিভাবক নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করে এবং সন্তান প্রতিপালনের পুরো প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন পন্থা অবলম্বন করে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সমস্যাকে হ্রাস করে এবং পরিবারে স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখে। রাসূল বলেন-

‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তাদের দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।' বুখারি ও মুসলিম

‘ওহে বিশ্বাসীরা! তোমরা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।' সূরা আত-তাহরিম : ৬

এই আয়াতটি মুসলিমদের ওপর আরোপিত আসমানি দায়িত্বের সারমর্ম বহন করে। একজন মুসলিমের নৈতিক ও আবশ্যিক কর্তব্য হলো—কাছের ব্যক্তিদের সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। সন্তানের সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি এবং জিম্মাদার হলো পিতা-মাতা। জিম্মাদার হিসেবে পিতা-মাতার এই কর্তব্যকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব মুসলিম জীবনের অপরিহার্য অংশ। ইসলামের প্রকৃত অস্তিত্বকে যথাযথ ও স্বাভাবিক উপায়ে জারি রাখার জন্য প্রত্যেক পিতা- মাতার অবশ্য কর্তব্য হলো—সন্তানদের মাঝে ইসলামের সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে তাদের মনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার অনুভূতি তৈরি করা।

বিভিন্ন বাস্তবিক কারণে অনেক পিতা-মাতার পক্ষে একাকী এমন কঠিন দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয় না। সেক্ষেত্রে সমাজের দায়িত্ব হলো- পরস্পরের মাঝে একটি যোগসূত্র (Network) তৈরি করা এবং সমাজের প্রত্যেককেই এই যোগসূত্রের আওতায় আনার চেষ্টা করা।

অন্যান্য সমাজের ন্যায় মুসলিম সমাজেও কিছু ‘দুর্বল’ পরিবার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সমাজের কর্তব্য হলো— এই সকল পরিবারকে সহায়তার জন্য পরিকল্পিত কাঠামো নির্মাণ করা। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব প্রধানত পিতা-মাতার ওপরই বর্তায়। সেক্ষেত্রে

পিতা- মাতা নিজ সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করল কি না, তা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সমাজের খুব বেশি কিছু করার নেই।

সন্তান লালন-পালনের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা যখনই মানুষকে সন্তানাদির নেয়ামত দেন, তখন থেকেই তাদের সুষ্ঠু-সুন্দর প্রতিপালন পিতা-মাতার দায়িত্বে এসে পড়ে । তারা শিশুটির বাহ্যিক এবং আত্মিক মুরুব্বি বা গুরু হয়ে যান। তাই একজন বাবা-মা যেমনিভাবে সন্তানের সুষ্ঠু সুন্দর ও সুঠাম দেহ গঠনের জন্য দিনরাত ফিকির করবেন; পাশাপাশি সন্তান যেন জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং সুন্দর শিষ্ঠাচার ও ভদ্র আচরণ শিখে; তার জন্য চেষ্টা করাও পিতা-মাতার দায়িত্ব ।

যখন কোনো পিতা-মাতা তাদের সন্তানের লালন-পালন সঠিক সুন্দর ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে করেন তখন এর দ্বারা শিশুর সুন্দর দেহই গঠন হয় না বরং এর ফলে শিশুর উন্নত চিন্তা ও মানসিকতাও তৈরি হয় ।এই জন্য বিজ্ঞজনেরা বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে আদব শেখায়, সে শত্রুকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করে।'

কোনো কোনো মনীষী এভাবেও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সন্তানকে শিশুকাল থেকেই আদব শেখায়, বড় হয়ে সে তার চক্ষুকে শীতল করে।' এজন্য সন্তানের সুন্দর তারবিয়াতের ব্যাপারে পিতা- মাতার উদাসিন থাকা উচিত নয়। কেননা, যে কৃষক তার ক্ষেতে ঠিকমত মেহনত করে না, ফসলের সঠিক পরিচর্যা করে না, তার জমিতে নানান ধরনের আগাছা জন্মায় এবং এক সময় তার ফসলই বিনষ্ট করে দেয় । ঠিক তেমনিভাবে বাবা-মা যখন শিশুর লালন-পালনের কোনো খেয়ালই করেন না, তখন শিশুটির মাঝে বিভিন্ন ধরনের বদস্বভাব সৃষ্টি হতে থাকে; যা তার ভবিষ্যৎ-জীবনে উন্নত ব্যক্তিত্ব গঠনে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এরশাদ করেছেন, 'প্রতিটি শিশু জন্মগতভাবে ইসলামের স্বভাব- চরিত্র নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বা মূর্তির উপাসক বানায়।' অর্থাৎ জন্মগতভাবে প্রত্যেক শিশুই ভালো স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা এবং পরিবেশ তার পথ ও লক্ষ্যকে পরিবর্তন করে দেয় এবং তার শান্তিময় জীবন ও আখেরাতকে নষ্ট করে দেয় । মূলত একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার উপর তিনটি জিনিসের প্রভাব কাজ করে।

(১) সর্বপ্রথম শিশুর বাবা-মা, পরিবার-পরিজন এবং বংশের প্রভাব
কাজ করে ।

(২) দ্বিতীয়ত তার পরিবেশ ও প্রতিবেশীর প্রভাব কাজ করে ।

(৩) অতঃপর শিশুটি যখন কোনো মাদরাসা বা স্কুলে শিক্ষা অর্জন করতে যায়, তখন সেই প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রভাবিত হয় ।

কিন্তু সর্বশেষ পিতা-মাতার উপরই দায়িত্ব আসে, তার সন্তানের এই তিনটি ব্যাপারেই খেয়াল রাখার যে, আমার সন্তান কোন্ পরিবেশ ও চিন্তা-চেতনায় বড় হচ্ছে।

একটি শিশুর জন্য জীবনের প্রথম আবাস ও আশ্রয়স্থল হলো মায়ের কোমল ও মায়ামাখা কোল। মায়ের কোলের সময়গুলোতে শিশুর জন্য মা একজন কাণ্ডারী ও দরদী সেবক হিসেবে কাজ করে। মা যদি শিশু সন্তানের উপর মেহনত করেন তবে এই শিশু তার মায়ের কোল থেকেই ভালোবাসা ও দয়ার পরশে সুন্দর চরিত্র ও যোগ্যবান হয়ে গড়ে উঠতে পারে। এজন্য সন্তান লালন-পালনের ক্ষেত্রে একজন মায়ের দায়িত্ব ও দায়-ভার সবচেয়ে বেশি এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ।

যে পিতা ঘরের অবস্থা সম্পর্কে অসচেতন এবং সন্তানের শিক্ষা- দীক্ষার ব্যাপারেও অমনোযোগী; তার সন্তান লাইনচ্যুত এবং বিপথগামী হয়ে থাকে। যেমন : কেউ কেউ নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ততার দরুন সংসারে ছেলে-মেয়ের খোঁজ-খবর রাখতে সময় পান না, ফলে তাদের সন্তানদের বেড়ে উঠা যথাযথ হয় না। উন্মুক্ত ও উশৃঙ্খল জীবন তাদের পেয়ে বসে।

এজন্যই বলা হয়ে থাকে-
ليس اليتيم الذي قد مات والده
إن اليتيم يتيم العلم والأدب
'সে এতিম নয় যার মা-বাবা মৃত্যুবরণ করেছে, বরং এতিম তো সে, যে ইলম ও আদব শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে।
একথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যে সন্তান তার মায়ের শাসন মানে না, আর অপরদিকে বাবার পক্ষেও সম্ভব হয় না ঘরে সময় দেয়ার; তো সেই শিশু জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে ঠিক, কিন্তু তার জীবিত থাকাটা কোনো এতিম শিশুর জীবিত থাকার মতোই ।

সুতরাং একথা শুনে রাখা উচিত, যে মায়ের এ বিষয় জানা নেই, সন্তানকে কিভাবে শাসন করতে হয়। অন্যদিকে বাবারও এ নিয়ে ভাবনার সময় হয় না; তবে নিশ্চিত জেনে নিন, সেই শিশুটি এতিম সমতুল্য, তার সুষ্ঠু লালন-পালন হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। অতএব জন্মদাতা পিতা-মাতার জন্য একান্ত আবশ্যক, তারা যেন ঘরের সকল কাজের ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানের লালন-পালনের বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে দেখেন। এবং নির্দিষ্ট একটি সময় তাদের পেছনে হয়তো এজন্যই কেউ বলেছেন, যখন আমি অবিবাহিত ছিলাম তখন সন্তানের লালন-পালনের পাঁচটি নানামূখী পরিকল্পনা (planning) ছিল আর এখন বিয়ের পর আমার পাঁচটি সন্তান, কিন্তু সন্তানদের লালন-পালনের পরিকল্পনা থেকে একটি পরিকল্পনাও আমার মাথায় নেই।

এমনই হয়, নিজে নিজেকে নানামুখী এতো কাজে ব্যস্ত রাখে যে, নিজের সন্তানের একটু দেখাশোনার সময় সুযোগও হয়ে ওঠে না। সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য অবশ্যই নিজেকে সময় বের করতে হবে। তাহলেই সন্তান হবে যোগ্য, আমরা হব গর্বিত। আর এই উম্মতের নতুন প্রজন্ম পাবে দ্বীন ও আখেরাতের জন্য একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ ধারক বাহক।

এ বিষয়টি অবশ্যই জেনে রাখবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি শিশুকে জন্মগত-ভাবেই অনুকরণ প্রিয় বানিয়েছেন । শিশু তার বড়কে যা করতে দেখে হুবহু সে ঐ কাজটিই করতে উদ্ভূত হয় । সে বড়দের মতো হতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। তাই সন্তান প্রথমত তার বাবা-মাকেই অনুসরণ করে থাকে। এই জন্য মা-বাবার উচিত, তারা যেন শুধু সমালোচকই না হন, অর্থাৎ এটা কেন করলে? এভাবে করলে কেন? এটা ওইভাবে হওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি। মোটকথা শুধু শাষাতেই না থাকা। হুমকি ধামকিতেই না রাখা, বরং সন্তানের সামনে পিতা-মাতা নিজেদেরকে আদর্শবান হিসেবে তুলে ধরা । শিশুকে হুমকি-ধামকি করার চেয়ে তার সামনে সুন্দর আদর্শ পেশ করাটাই অধিক উপকারী । শাসন তো দুনিয়ার সকল মানুষই করতে পারে, কিন্তু শিশুর জন্য নিজে পরিশুদ্ধ ও আদর্শবান হওয়া এটা কয়জন পারে। তাই বাবা-মায়ের উচিত, তারা যেন সন্তানের সামনে আদর্শ পিতা-মাতা হিসেবে জীবনযাপন করেন।

প্রতিপালনের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়ার বিশেষ দৃষ্টি ও অবদান

পরিবার গঠনে ইসলামি শরিয়ার বিশেষ অবদান রয়েছে। এ জন্য প্রণয়ন করেছে সাবলীল ও বিশুদ্ধ কিছু নীতিমালা। যেন পরিচ্ছন্ন ভালোবাসা, হৃদ্যতা এবং আন্তরিকতা বজায় থাকে পরিবারের সদস্যদের মাঝে। তা হলেই সন্তানেরা হিংসা- বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে মা-বাবার কোলে সুন্দর এক জীবন-যাপন করতে পারবে। সন্তানের সুস্থতা, সুরক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠার প্রসঙ্গে ইসলামি শরিয়া মা- বাবাকে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে। এগুলোই তো প্রতিপালন। তবে স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে গেলে শরিয়া তাদের সন্তানদের নষ্ট বা বখে যাওয়ার সুযোগ রাখেনি। স্বনির্ভরতা ও জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তাদের শিক্ষা এবং সহযোগিতায় কাজ করে ইসলাম।

এই ক্ষেত্রে শরিয়ার রয়েছে সুউচ্চ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশনা। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ও রেষারেষিপূর্ণ মন্দ পরিবেশে সেই দিকনির্দেশনাগুলো বয়ে আনবে ভালো ও উত্তম পরিবেশ। তাদের উভয়ের বাড়ন্ত সন্তানের কল্যাণার্থে সেগুলো মেনে নিলে ন্যায়ানুগ একটা অবস্থানে পৌঁছা অবশ্যই সম্ভব। সন্তান তো তাদের উভয়েরই। তাকে নিয়ে চিন্তাও রয়েছে দুজনের।

স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে প্রতিপালনের ব্যাপারে সন্তানের উপকারের দিকে ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, মায়ের প্রতি লক্ষ রেখেছে। যেহেতু সন্তানের প্রতি তার মমতাটা একটু বেশি। তাছাড়া সন্তানের সাথে তার নিবিড় এক সম্পর্ক রয়েছে। যেহেতু সে তারই নাড়ি ছেঁড়াধন। এসব দিক বিবেচনায় ইসলাম সর্বপ্রথম মাকে সন্তানের সাত বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিপালনের অধিকার দিয়েছে। এরপর তার পর্যায়ক্রমিক নিকটাত্মীদেরকে। সাত বছরের পরে বাচ্চা পৌঁছে যায় ভিন্ন এক স্তরে। সেই স্তরে পৌঁছার পর ইসলাম নির্ধারণ করতে বলে একজন বিচারক। সে এই প্রতিপালনের দায়িত্ব এককভাবে বাবা অথবা মায়ের ওপর অর্পণ করবে। কিংবা

বিষয়টাকে বাবা-মায়ের ইচ্ছাধীন বানিয়ে দেবে। এটাই হচ্ছে ইনসাফ ও দয়ার চাহিদা এবং যথাযোগ্য ব্যবস্থাপনা।

লালনপালনের দায়িত্বপ্রাপ্তির শর্তসমূহ লালনপালনের দায়িত্ব পেতে হলে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ থাকা জরুরি:

১. মা অন্য কারও বিবাহ-অধীন না হওয়া।

২. বিশ্বস্ত হওয়া।

৩. মা-বাবা ছাড়া অন্য কেউ প্রতিপালন করলে সেই লোকের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা থাকা।

৪. লালনপালনে সক্ষম হওয়া।

৫. মহিলা শিশুর কোনো নিকটাত্মীয় হওয়া, তবে নিকটাত্মীয় মাহরাম না হলে প্রতিপালন করতে পারবে না। যেভাবে অনাত্মীয় মাহরামের জন্য প্রতিপালনের দায়িত্ব বর্তায় না। যেমন : দুধমা কিংবা দুধ-বোন; তাদের জন্য প্রতিপালনের কোনো হক সাব্যস্ত হবে না। সন্তান প্রতিপালনকারী মহিলা মুরতাদ না হওয়া। মুরতাদ হলে প্রতিপালিতকে নষ্ট করেফেলবে।'

প্রতিপালনের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত কোনো মহিলা না থাকাবস্থায় যে পুরুষের প্রতিপালনের হক রয়েছে তার মধ্যে থাকতে হবে নিম্নোক্ত শর্তাবলি :

১. স্বাধীন হওয়া।

২. বিবেক সম্পন্ন হওয়া।

৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

৪. শিশু লালন পালনে সক্ষমতা থাকা।

৫.বিশ্বস্ততা।।

৬. মেয়ে শিশু হলে সেই মেয়ের সাথে বিয়ে হারাম এমন কোনো আত্মীয় হওয়া।

৭. শিশুর 'আসাবা' তথা রক্ত সম্পর্কীয় কোনো নিকটাত্মীয় হওয়া। এমন আত্মীয় একাধিক থাকলে মিরাস প্রাপ্তিতে যে অগ্রগণ্য সে-ই বেশি উপযুক্ত।

প্রতিপালন-সংক্রান্ত দলিলসমূহ

শিশুর প্রতিপালন কুরআন, হাদিস এবং ইজমা তথা উম্মাহর ঐক্য দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনের দলিল হচ্ছে, এই আয়াত,

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ.

অর্থ : দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চাইলে মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু-বছর দুধ খাওয়াবে।

হাদিসের দলিলগুলো নিম্নরূপ :

১. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, একবার এক মহিলা এসে বলল, আল্লাহর রাসুল! এই সন্তানটি আমার গর্ভজাত। সে আমার স্তনের দুধ পান করেছে। আমার কোল হচ্ছে তার আশ্রয়স্থল। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন সে আমার কাছ থেকে সন্তানটিকে কেড়ে নিতে চাচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, অন্যত্র বিয়ে না বসা পর্যন্ত তুমিই তার অধিক হকদার।

২. বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, আলি, জায়েদ ইবনে হারিসা এবং জাফর ইবনে আবি তালিব রা.-এর মধ্যে হামযার মেয়েকে কেন্দ্র করে বাদানুবাদ হয়। আলি রা. বলেন, আমি তাকে নেওয়ার বেশি যোগ্য। কারণ, সে আমার চাচার মেয়ে! জাফর বললেন, সে আমারও চাচার মেয়ে আর তার খালা আমার স্ত্রী। (তাই তাকে নেওয়ার আমি অধিক যোগ্য।) জায়েদ ইবনে হারিসা রা. বললেন, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে।

(তাকে আমিই নিবো) তখন নবিজি মেয়েটিকে তার খালার জন্য ফায়সালা দিয়ে বললেন, খালা তো মায়ের মতো।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি এক বাচ্চাকে তার বাবা কিংবা মায়ের কাছে থাকার অধিকার দিয়েছিলেন।

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, এক মহিলা এসে বলল, আল্লাহর রাসুল! আমার থেকে আমার স্বামী আমার সন্তান নিয়ে যেতে চাচ্ছে। অথচ এই সন্তান আমাকে আবু ইনাবার কূপ থেকে পানি এনে পান করায়। এছাড়াও সে আমার অনেক খিদমত করে। নবিজি বললেন, তোমরা দুজন এ বিষয়টা লটারির মাধ্যমে ফায়সালা করো। কিন্তু স্বামী বলল, আমার সন্তান আমার থেকে কেড়ে নেওয়ার অধিকার কার আছে? নবিজি তখন সেই সন্তানটিকে লক্ষ করে বললেন, তিনি তোমার বাবা এবং তিনি তোমার মা। সুতরাং তাদের মধ্যে তুমি যার ইচ্ছা তার হাত ধরতে পারো। তখন সন্তানটি তার মায়ের হাত ধরে। ফলে মহিলাটি তাকে নিয়ে চলে যায়।

৫. রাফে ইবনে সিনান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি ইসলাম কবুল করলে তাঁর স্ত্রী বেঁকে বসে। সে ইসলাম গ্রহণে রাজি হয় না। (ফলে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।) এরপর মহিলাটি নবিজির কাছে এসে বলল, এটি আমার কন্যা। সে এখনও দুগ্ধপোষ্য। কিংবা মহিলাটি এমনই বলল। (তাই সে আমার কাছেই থাকবে) পক্ষান্তরে রাফে রা. বলেন, এটি আমার কন্যা। (আমার কাছে থাকবে।) নবিজি রাফে রা.-কে বললেন, তুমি বসো এক পাশে এবং মহিলাকে বললেন, আর তুমি অপর পাশে বসো। এরপর মেয়েটিকে উভয়ের মাঝখানে বসিয়ে বললেন, এখন তোমরা দু-জনেই তাকে ডাকো। ডাকার পর মেয়েটির ঝুঁকছিল তার মানে দিকে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দুআ করে বললেন, হে আল্লাহ! কন্যাটিকে সঠিক পথ দেখাও। এরপর মেয়েটি তার পিতার দিকে ঝুঁকে পড়ল। ফলে সে (পিতা) তাকে গ্রহণ করল।

প্রতিপালনের বিষয়টি ইজমা দ্বারাও প্রমাণিত। হাম্বলি ফিকহে এসেছে, শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ এবং তার প্রতিপালন করা ওয়াজিব। মালিকি ফিকহে বর্ণিত হয়েছে, ছোট্ট শিশুদের দায়িত্ব গ্রহণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা তথা গোটা উম্মাহর ঐকমত্য রয়েছে।

অন্যসব অধিকারের মতো শরিয়া শিশু অধিকার সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। খুব সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করেছে। মানুষ এই শরিয়া ছেড়ে অন্য কোনো বিধানের দিকে গেলে অচিরেই অস্থির ও পেরেশান হয়ে তাকে ফিরতে হবে ইসলামি শিক্ষার দিকেই।

মানুষের মুখের বুলির মতো ফাঁপা আইনে পূর্ণ সেসব চাকচিক্যময় আইন ছেড়ে ইসলামি শিক্ষার ছায়াতলে ফিরে আসতে হবে। কেননা, ইসলামি শরিয়া ও বিধান সর্বত্র এবং সর্বকালের জন্য যথোপযুক্ত।

যাইহোক, পুর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি, জন্মের পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিশুর প্রতিপালনের সময়টা দুই স্তরে বিভক্ত :

প্রথম স্তর : এটাই হচ্ছে প্রকৃত প্রতিপালন। এই সময়ে শিশুর বিশেষ যত্ন ও সেবার প্রয়োজন পড়ে। এটা সাধারণত ভালো করতে পারে নারীরাই। ছেলে হলে স্তরটি এমন বয়সে শেষ হয় যখন সে নিজেই নিজের প্রয়োজন সমাধা করতে পারে। কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন সেই বয়সটা হলো সাত বছর। ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রতিপালিকা মা হন বা অন্য কেউ, হুকুম অপরিবর্তিত থাকবে।

কিন্তু মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে প্রতিপালিকা মা কিংবা দাদি হলে হুকুম এক ধরনের। অন্য কেউ হলে ভিন্ন ধরনের। প্রতিপালিকা যদি মা কিংবা দাদি হয় তা হলে নেয়ে তার কাছে থাকবে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত। মা, দাদি ছাড়া অন্য কারও প্রতিপালনে থাকলে তার কাছে নয় বছর বয়স পর্যন্ত থাকতে পারবে। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার কাছাকাছি

বয়স অবধি থাকতে পারবে। হানাফি মাজহাবের ফতোয়া এটাই। ইমাম আহমদ রহ. থেকেও এ ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় স্তর : মূল প্রতিপালনের পরবর্তী স্তর এটি। এ সময় শিশুকে হস্তান্তর করা হয় তার অভিভাবকের কাছে। যিনি ব্যবস্থা করবেন শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা এবং শিষ্টাচারের। শিশুটি ছেলে হলে নিজ প্রয়োজনীয় কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার পরে তাকে হস্তান্তর করতে হবে অভিভাবকের কাছে। মেয়ে হলে প্রাপ্তবয়স্কা হবার আগ পর্যন্ত মা কিংবা দাদির প্রতিপালনেই থাকবে। যদি প্রতিপালিকা হয়ে থাকেন তারা। অন্য কেউ প্রতিপালিকা হলে ভালো-মন্দের স্বাভাবিক বুঝ না আসা পর্যন্ত তার কাছে থাকবে। এরপর থেকে থাকবে বাবার নিকটে। বাবাই তখন মেয়ের শারীরিক ও মানসিক যত্ন এবং তার ইজ্জত হিফাজতের ব্যবস্থা করবেন। ছেলে হলে তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এবং ভালো পথের নির্দেশনা দেওয়া বাবার দায়িত্ব।

সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

সন্তান বেড়ে ওঠার পাশাপাশি প্রয়োজনমতো তারবিয়া দেওয়া বাবা-মায়ের দায়িত্ব। এই সময়ে শেখানোর মতো সর্বোত্তম বাক্য হচ্ছে "লা ইলাহাইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।" এই কালিমাকে উপস্থাপন করবে শিশুর কাছে সান্ত্বনা বাণী রূপে। (অর্থাৎ শিশু কাঁদলে বা বিরক্ত করলে এটা শুনিয়েই যেন তাকে শান্ত করা যায়। এছাড়াও তাকে বিভিন্ন বাক্য শিখাবে। সুতরাং বাবা-মা তাকে কথা বলার ভঙ্গি এবং ধরন শেখাবে।

যেসব বিষয়গুলো শিশুদের জন্য উপকারী এবং শারীরিক শক্তি যোগায় তাদের সেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে। আমিরুল মুমিনিন ওমর রা. বলেন, সন্তানদের তোমরা সাঁতার এবং তীর চালনার প্রশিক্ষণ দেবে। তাদের বলবে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে।

সাত বছর বয়সে সন্তানকে নামাজ শিক্ষা দেওয়া এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করা পিতার ওপর আবশ্যক। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, সাত বছর হলে তোমরা সন্তানদের নামাজের আদেশ দেবে। আর দশ বছর বয়সে নামাজ ছাড়লে প্রহার করবে। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের বিছানা পৃথক করে দেবে। ১০ বছরের আগে শিশুকে প্রহার করা, তার সাথে রূঢ়তা দেখানো থেকে বিরত থাকা পিতা-মাতার ওপর আবশ্যক। ১০ বছর বয়সে নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করলে মৃদুভাবে প্রহার করা যায়।

নবিজি ছিলেন স্নেহের প্রতীক। বুখারি ও মুসলিমে আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ আদায় করতেন নিজ কন্যা যয়নবের মেয়ে উমামা রা.-কে কাঁধে নিয়ে। রুকু, সিজদায় যাওয়ার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন। আবার দাঁড়ানোর সময় তুলে নিতেন। এভাবেই পুরো নামাজ শেষ করেন।

সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হচ্ছে, কুরআন শিক্ষা। শিশুর পিতা-মাতার উচিত, সন্তানদের ছোটো থেকেই কুরআন শিক্ষা দেওয়া। সন্তানের সুন্দর নাম রাখা এবং তাকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া পিতা থেকে সন্তানের প্রাপ্য অধিকার।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানকে আদব শিক্ষাদান পিতার ওপর সন্তানের আবশ্যকীয় হক রূপে সাব্যস্ত করেছেন। আবু সাঈদ এবং ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কারও সন্তান হলে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে। উত্তম আদব শিক্ষা দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তার বিয়ের ব্যবস্থা করে। প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরেও বিয়ের ব্যবস্থা না করায় সন্তান কোনো গুনাহে জড়ালে তার দায়ভার পিতাকেও বহন করতে হবে।

নবিজি শিশুদের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তাদের খুব গুরুত্বের সাথে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন। এমনকি খাবার-দাবারসহ ছোটো ছোটো বিষয়গুলিও তাদের শিখাতেন।

ওমর ইবনে আবু সালামা রা. ছোটোবেলায় একবার রাসুলের সামনে খেতে গিয়ে পাত্রের এখানে-সেখানে হাত দিচ্ছিলেন। এটা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, বাবু! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার করবে। আর সবসময় নিজের সামনে থেকে খাবে। (যদি খাবারটা একই ধরনের হয়।)

ইবনে আব্বাস রা.-কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে তরুণ! তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি । সেগুলো হচ্ছে, তুমি আল্লাহ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে তা হলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখবে আল্লাহকে তুমি কাছে পাবে। কিছু চাইতে হলে আল্লাহ তাআলার কাছেই চাইবে।

আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ পাকের দরবারে করবে। আর জেনে রেখো, সব মানুষ তোমার উপকারে এগিয়ে এলেও ততটুকু উপকারই তারা করতে পারবে, যতটুকু তোমার ভাগ্যে আল্লাহ লিখে রেখেছেন। অপরদিকে সবাই মিলে তোমার ক্ষতি করতে চাইলেও ততটুকুর বেশি ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না যতটুকু আল্লাহ তাআলা তাকদিরে লিখে রেখেছেন। (ভাগ্য লেখার) কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (অর্থাৎ তাকদির সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত।)

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনে আব্বাস রা.- কে বলেন, তুমি আল্লাহকে প্রিয় বানাও। তা হলে সর্বদা তাকে কাছে পাবে। স্বাচ্ছন্দের দিনে আল্লাহকে মনে রাখলে কষ্টের দিনে তিনি তোমার পাশে থাকবেন। আর জেনে নাও, যেটা হাতছাড়া হয়ে গেছে তা পাওয়ার কথা ছিল না। আর যেটা তুমি পেয়ে গেছ সেটা হারানোর ছিল না। আর জেনে রেখো, ধৈর্যধারণ করলে সাহায্য মিলে আর কষ্টের সাথেই পাবে মুক্তি। দুঃখের পরেই রয়েছে স্বস্তি।

ইবনে আব্বাসকে লক্ষ্য করে দেওয়া উপরিউক্ত নববি উপদেশগুলো কিন্তু গোটা উম্মতের জন্যই প্রযোজ্য।

সন্ন্যাসবাদ গ্রহণ কিংবা দুনিয়াবী জীবনের চিন্তা ত্যাগের কথাও কিন্তু এখানে বলা হয়নি; বরং এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বিশুদ্ধ আকিল। যে আকিদা লালনে কোনো পদমর্যাদা কিংবা সম্মানের লোভ প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। অন্তরে দৃঢ় ইমান গেঁথে দেওয়া হয়েছে যাতে দারিদ্র্য কিংবা বঞ্চনায় চিড় ধরবে না। ধনাঢ্যতা কিংবা ভোগ-বিলাসিতায় চাপা পড়বে না।

কুরআন ও হাদিসের উপরোল্লেখিত ভাষ্যগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, শরিয়তে ইলম ও শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু! সুতরাং প্রতিটি বাবার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, নিজ সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে উত্তম আখলাকের ওপর মানুষ করা।

শিশু পরিপূর্ণ কথা শিখার পর সর্বোত্তম হচ্ছে, সবার আগে কুরআন শিক্ষা দেওয়া। কেননা এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের শক্তিশালী মাধ্যম। কুরআন দিয়ে কথা বললে তা সত্য হয়। কুরআনের মাধ্যমে বিচার করলে সেটা নিষ্ঠাপূর্ণ হয় এবং কুরআন আঁকড়ে ধরলে কেউ পথভ্রষ্ট হয় না।

এরপর শিশুর ধারণক্ষমতা অনুযায়ী কুরআন ও হাদিস শিখার পাশাপাশি সাত বছর হলে তাকে নামাজও শিখাতে হবে। এই শিক্ষাটা নেককার লোকদের তত্ত্বাবধানে হওয়া চাই।

কুরআন-হাদিস দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি ও উৎস। সন্তান যদি শিক্ষিত হয় কুরআন-হাদিসের গভীর জ্ঞানে। আর এতে উল্লেখিত বিধানাবলি, ইবাদত, লেনদেন ও শিষ্টাচারের গভীর বুঝ তার মাঝে এসে যায়। সেই সঙ্গে ইলম অনুযায়ী আমলও করে; তা হলে নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখিত আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আয়াতটি হচ্ছে,

অর্থ : বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে আলেমগণই ভয় করেন। আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের পর ইসলামি এক ঐতিহাসিকের মতামতও গ্রহণ করতে পারি। তিনি হলেন ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন।

ইবনে খালদুনের মত হলো, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে শিক্ষা কারিকুলাম ও সিলেবাস বিভিন্ন হতে পারে। তবে মুসলিমরা এ ব্যাপারে একমত, কুরআন হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি এবং ইসলামি জ্ঞানের অন্যতম উৎস। এজন্যেই এটাকে তারা অন্তর্ভুক্ত করেছে ইসলামি শিক্ষাদীক্ষার মূলনীতিতে। এই কথাগুলোই স্পষ্ট হয়েছে তাঁর এই বক্তব্যে, “জেনে রাখুন, বাচ্চাদের কুরআন শিক্ষাদান ধর্মীয় একটি নিদর্শন। গোটা মুসলিম উম্মাহ এই শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তাই সব মুসলিম দেশ নিজেদের প্রাথমিক কুরআনের আয়াত এবং কিছু হাদিস শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

যেগুলো শিক্ষার্থীদের অন্তরে দৃঢ় ইমান ও বিশ্বাস সৃষ্টি করে। এই কারণেই কুরআন সব শিক্ষার ভিত্তি। কুরআনকে মূল ভিত্তি বানানোর কারণ হচ্ছে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মূল জন্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রভাব হয় সুদূর প্রসারী। এটিই পরবর্তী সব শিক্ষার মূল ভিত্তি হয়।" (ভিত্তিটা যেন সুন্দর ও মজবুত হয় সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।)

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বাবার দায়িত্ব হলো, সন্তানকে ইসলামের ফরজ, ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব বিষয়াদি শিক্ষা দেওয়া। সেই সঙ্গে তাদের জাগতিক বিষয়াদিতেও পারদর্শী করে তোলা। যেগুলো তার নিজের এবং মুসলিম জাতির জন্য বয়ে আনবে প্রভূত কল্যাণ। আর এটাই হচ্ছে প্রত্যাশিত শিক্ষা। মোটকথা, পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কথা মেনে বড়ো করবে। সে জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো তাদের মেনে চলতে হবে।

বাবা এবং অভিভাবকের কিছু দায়িত্ব

ক. সন্তানকে ঈমানি শিক্ষা দেওয়া

শিশুর মুখে কথা ফুটলেই ভালো ভালো কথা শিক্ষা দেওয়া। সর্বোত্তম কথা হচ্ছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" বুঝ হওয়া মাত্রই সন্তানকে হালাল-হারাম চিনানো। সাত বছর হলে নামাজের আদেশ দেওয়া। আল্লাহ, রাসুল এবং কুরআনের ভালোবাসায় তাকে গড়ে তোলা। ইসলামের পাঁচ রোকন, ইমানের ছয় রোকন এবং ইহসানের রোকনগুলো তাকে শিখানো।

ইসলামের পাঁচ রোকন হচ্ছে এই : ১. কালিমা। ২. নামাজ। ৩. রোজা। ৪. হজ। ৫. যাকাত।

আর ইমানের ছয় রোকন হলো এই : ১. আল্লাহর প্রতি ইমান আনা। ২। ফেরেশতাদের প্রতি ইমান আনা। ৩. নবিগণের প্রতি ইমান আনা। ৪. আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি

বিশ্বাস স্থাপন করা। ৫. তাকদিরের প্রতি ইমান আনা। ৬. পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস রাখা।

আর ইহসানের রোকন হচ্ছে, এই ধ্যানে ইবাদত করা যে, যেন সে আল্লাহকে দেখছে। এটা না হলে কমপক্ষে তিনি তো দেখছেন অবশ্যই। সন্তানের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং তাকওয়ার বীজ বপন করে দেওয়া। গোপনে এবং তাকে প্রকাশ্যে আল্লাহর ধ্যানে থাকার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

খ. সন্তানকে চারিত্রিক দীক্ষা দেওয়া

ইমানি শিক্ষার একটি অনিবার্য শুভ পরিণতি হচ্ছে এই চারিত্রিক দীক্ষা। সত্যবাদিতাসহ সন্তানদের সব ভালো গুণের শিক্ষা দিতে হবে। মিথ্যা এবং অন্যসব মন্দ স্বভাব থেকে তাদের সতর্ক করতে হবে।

গ. সন্তানদের শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া

সন্তানদের জন্য হালাল সম্পদ খরচ করবে। তাদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। অসুস্থতার কারণগুলো থেকে দূরে রাখবে। তাদের কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাবে। “ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কারও ক্ষতি করা যাবে না” এই নীতিতে সন্তানদের বড়ো করবে। নিরাপত্তা থাকলে তির চালনা, ঘোড়ায় চড়া এবং সাঁতারের প্রশিক্ষণ দেবে। সাহসিকতা ও বীরত্বের ওপর অভ্যস্ত করে তুলবে। ক্ষতিকর সবকিছু থেকে দূরে রাখবে।

ঘ. সন্তানদের বুদ্ধিবৃত্তিক দীক্ষা দেওয়া

সন্তানদের ছোটো থেকেই উপকারী বিষয়গুলো শিখাবে। তাদের যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ, মন্দ কাজ বিবেক ও মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলে। যেমন, মদপান, ধূমপান ইত্যাদি।

ঙ. আত্মিক শিক্ষা দেওয়া

সন্তানদের দুর্বলতা, অস্থিরতা, ভয়, হিংসা, রাগ এবং হীনমন্যতা থেকে দূরে রাখবে। তাদের মাঝে তাকদিরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি করবে।**চ. সামাজিক শিক্ষা দেওয়া** সন্তানদের মানুষের হকের প্রতি যত্নবান হওয়া শিখাবে। এছাড়াও তাদের দয়া, মমতা, তাকওয়া, আত্মোৎসর্গ, সাহসিকতা ইত্যাদি গুণে বড়ো করে তুলবে।

ছ. সন্তানদের বিকৃত যৌনতা থেকে সতর্ক করবে, প্রয়োজনে বিয়ে করিয়ে দেবে।

প্রভাবক কয়েকটি তারবিয়াত-মাধ্যম, যেগুলো ব্যবহার করা বাবা এবং মুরুব্বির উচিত। সেগুলো নিম্নরূপ :

ক. আদর্শের মাধ্যমে তারবিয়া দেওয়া

বাবা এবং মুরুব্বি সন্তানের জন্য সব বিষয়ে উত্তম আদর্শ হওয়া। অর্থাৎ ইবাদত, দানশীলতা, দুনিয়াবিমুখতা, বিনয়, সহনশীলতা এবং বীরত্ব সর্বক্ষেত্রে পিতা এবং মুরব্বি উত্তম এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। রাসুলকে আদর্শ হিসেবে নিজের সামনে রাখবে। তা হলেই তার শিক্ষাদান ফলপ্রসূ হবে এবং সন্তান তাদের অনুসরণ করবে।

খ. ইবাদতের মাধ্যমে তারবিয়া দান

পিতা সন্তানদের ইবাদতের অভ্যাসে গড়ে তুলবে। তাদের ইখলাস ও সুন্নতসহ বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের পদ্ধতি শিখাবে।

গ. ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে তারবিয়া প্রদান

লুকমান হাকিম যেমন নিজ ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি সন্তানদের বিভিন্ন উপদেশ শোনাবে। সেই উপদেশগুলো হবে কুরআন ও হাদিস থেকে সংগৃহীত।

ঘ. চোখে চোখে রাখার দ্বারা তারবিয়া দান

পিতা-মাতা সন্তানদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও কার্যক্রমের দিকে খেয়াল রাখবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখলে হিকমার সাথে সংশোধন করবে।

শাসনের মাধ্যমে; মৃদুভাবে প্রহার করা। এছাড়াও অন্য কোনো অপরাধে ভিন্ন কোনো শাস্তি দেও প্রয়োজনে কিছু শাস্তি দেওয়া। দশ বছর হওয়া সত্ত্বেও নামাজে অবহেলা করে

যেতে পারে। তবে সেই শাস্তি শরিষাসম্মত হতে হবে।"

তারবিয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি, যেগুলো পিতা এবং মুরুবিব অনুসরণ করবে

ক. আকিদাগত সম্পর্ক স্থাপন

সন্তানদের শুরু থেকেই ইমানের ছয়টি রোকন এবং ইসলামের পাঁচটি রোকে সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া জরুরি। তা হলেই তারা আল্লাহর ধ্যান ও খেয়ালের সাথে বেছে ছাঁবে। এ সংক্রান্ত আলোচনা "সন্তানদের ইমানি শিক্ষাদান" শিরোনামে গত হয়েছে।

খ. আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন

ইবাদতের সাথে সন্তানদের আত্মিক একটা সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া। সন্তানদের নামাজের নির্দেশ দেওয়া। সক্ষম হলে রোজা এবং বাবা (আর্থিকভাবে ও শারীরিকভাবে) সপ্তম হলে সন্তানকে হজের আদেশ দেওয়া। বাবা ও মুরব্বি স্বচ্ছল হলে জাকাত ও সদকার ইবাদত আদায়ে সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া। কুরআনের সাথে সন্তানের সম্পর্ক তৈরি করা। তাকে কুরআন শেখানো এবং হেফজ করানো। এছাড়া আল্লাহর ঘর মসি এবং

জিকিরের সাথে সন্তানকে জুড়ে দেওয়া। সেজন্য সময় করে তাকে সকাল-সন্ধ্যার তাসবিহ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পরবর্তী তাসবিহসহ অন্যান্য তাসবিহগুলো শেখানো।

১. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানের সাত বছর বয়স থেকে পিতা-মাতাকে তার নামাজ শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হতে বলেছেন। পিতা-মাতা আদর-সোহাগ, উৎসাহ-উপদেশ দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে সাত বছর থেকে নামাজি করে তুলতে। প্রয়োজনে উপহার দিবে। পুরস্কৃত করবে। দশ বছর হওয়ার আগ পর্যন্ত তার হাতে সময় হলো চার বছর। মাস হিসাবে আট চল্লিশ মাস। দিন হিসাবে প্রায় ১৪০০ দিন। দীর্ঘ চার বছর ক্রমাগত উপদেশ, উৎসাহ, ভালোবাসা দিয়েও যদি সন্তান নামাজের প্রতি সাড়া না দেয়, তা হলে দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর এবার পিতা-মাতা আরেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করবে। সেটা হলো শাসনের পদ্ধতি। এবার তাকে ভয় দেখাবে জাহান্নামের, শাসনের। ভয় না পেলে এবং নামাজ না পড়লে এবার মারার সুযোগ আছে। যাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আজাব থেকে সন্তান বেঁচে যেতে পারে। তবে এ মারাটা শাস্তি দানের জন্য হবে না। শাস্তির জন্য মারা হারাম। এতে মানুষের মানহানী করা হয়। (তবে হক নষ্টের অপরাধে কাজির শাস্তি এখানে ধর্তব্য না।) সংশোধনের জন্য, শিক্ষার জন্য মারবে। প্রহার অবশ্যই মৃদু হতে হবে। শরীরে দাগ হয় এভাবে মারবে না। আব্বাস রা. বলেন, মিসওয়াক বা এজাতীয় জিনিস দিয়ে মারবে। প্রহার প্রসঙ্গ তখনই আসবে যখন কারো ক্রমাগত উপদেশ ও ভালোবাসায় কাজ হয় না। কারো যদি এতেই কাজ হয়ে যায়, তা হলে মারার কোনো প্রশ্নই আসে না। মারটা হলো রোগীর অনুষের মতো। যেহেতু সকলের মানসিকতা এক নয়। কাউকে সহজ করে বললেই মেনে দেখা আবার কাউকে সহজ করে বললেও কাজে দেয় না। তখন তাকে শাসন করতে হয়।

বিভিন্ন ওষু, তাহাজ্জুদ এবং সালাতুল ইস্তিখারা। তেমনি সন্তানকে পরিচয় করে দেওয়া বিভিন্ন নফল রোজার সাথে। যথা : আরাফার দিন এবং ১০ই জিলহজের রোজা। পূর্ব কিংবা পরের দিনসহ আশুরার রোজা, শাওয়ালের ছয় রোজা ইত্যাদি। যথাসম্ভব

এগুলোতে অভ্যস্ত করার চেষ্টা করা। গোপনে, প্রকাশ্যে আল্লাহকে মনে রাখার অনুশীলন করানো। সামাজিক শিষ্টাচারগুলোর সাথে পরিচিত করে তোলা। আল্লাহর হকসমূহ জানানো। এরপর অন্যান্য মানুষের হকগুলো সম্পর্কেও সচেতন করে তোলা। এই কথা “সামাজিক শিক্ষা দেওয়া।” শিরোনামে অতিবাহিত হয়েছে পূর্বেই।

ইলম ও উলামায়ে কেরাম, সৎসঙ্গ এবং শিক্ষা বিষয়ক মুরব্বির সাথে সন্তানের সম্পর্ক থাকাটাও সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত।

গ. সতর্ককরণ-নীতি

পিতা এবং মুরব্বি সন্তানকে নাস্তিকতা, ধর্মহীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে সচেতন করবে। সন্তানদের গানবাদ্য, জুয়া ও দাবা খেলা, নৃত্য করা, মন্দ জিনিস এবং অশ্লীল সিরিয়াল দেখা ইত্যাদি হারাম এবং বিভিন্ন অনর্থক বিষয়াবলি থেকে সতর্ক করবে। কারও অন্ধ অনুসরণ, মন্দ বন্ধু গ্রহণ, নোংরা স্বভাব চরিত্র থেকে সতর্ক করবে। পোশাক, খাবার-দাবার, দাড়ি চাঁছা, টাখনুর নিচে কাপড় পরাসহ সব ধরনের হারাম কার্যাবলি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবে।

তারবিয়ার ক্ষেত্রে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো পিতা-মাতার আমলে নেওয়া উচিত। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হচ্ছে এই

১. সন্তানদের (তার বিবেচনায়) সর্বোত্তম উপার্জন-মাধ্যমের দিকে আগ্রহী করে তোলা। তাদের যোগ্যতার প্রতি খেয়াল করা।

২. বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি না করে বৈধ বিষয়গুলোতে সুযোগ দেওয়া।

৩. মসজিদ-মাদ্রাসা এবং ঘরের মাঝে সামঞ্জস্য তৈরি করা। অর্থাৎ ঘরে দ্বীনি পরিবেশ চালু করা।

৪. মুরব্বি ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়ন করা।

৫. ইলম-সংক্রান্ত উপকারী উপকরণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা।

৬. রাতদিন এমন তারবিয়াতি পন্থায় কাটানো যেন সন্তানের ইহকালীন পরকালীন উপকার হয়।

সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া

মায়ের পেট থেকে দুনিয়াতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকে শিক্ষাদান শুরু হয়ে যায়। কেননা জন্মের পরপরই মুস্তাহাব হলো, শয়তান বিতাড়নের জন্য তার কানে আজান দেওয়া। যেন শুরুতেই তার কানে সর্বোত্তম কথামালা পৌঁছে যায়। (আর এটাই গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা।)

হাদিসে এসেছে, আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত, আমি দেখেছি, নবিজিকে হাসান ইবে আলির জন্মের পর তার কানে নামাজের মতোই আজান দিতে। এই আজান হচ্ছে, শিশুর কানে যাওয়া সর্বোত্তম বক্তব্য। তাছাড়া নবজাতকের অন্তর ও মস্তিষ্ক থাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। তাই সব কিছুর আগে তাকে আল্লাহর জিকিরের কথা শুনিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। এই জিকিরের ফলে শয়তানও দূর হয়ে যায়।

এরপর সন্তান শিক্ষা গ্রহণের বয়সে পৌঁছলে পিতার দায়িত্ব তাকে উত্তম শিক্ষা দেওয়া। আর সেই বয়সটা শুরু হয় শিশু যখন কথা বলতে সক্ষম হয় তখন থেকেই। সর্বপ্রথম তাকে শিখাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং তার অন্তরে ইসলামের ভালোবাসা গেঁথে দেবে। পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দেবে এমন ইলম যা মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেয় তার সৃষ্টিকর্তার সাথে। আর এটাই প্রকৃত ইলম।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

অর্থ : আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং আলেমগণও (দেন এই সাক্ষ্য।) আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আর তিনিই হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সুরা আলে ইমরান : ১৮)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكرمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ علم الإنسان مالم يعلم.

• পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি (সবকিছু) করেছেন। অর্থ : সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। মানুষকে শিখিয়েছেন তার অজানা বিষয়। (সুরা আলাক : ১-৫)

আরেক আয়াতে এসেছে,

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا

অর্থ : বলুন, (হে নবি!) যারা জানে আর যারা জানে না; তারা কি কখনো সমান হতে পারে? উপদেশ গ্রহণ তো কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। (সুরা যুমার : ৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا.

অর্থ : বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে শুধু উলামায়ে কেরাম। (সুরা ফাতির : ২৮)

হাদিসেও সন্তানদের ইহকালীন ও পরকালীন উপকারী ইলম শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ এসেছে। সন্তানদের সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার জিকির শিক্ষা দিতে হবে। যা সর্বাধিক উত্তম ও সুমধুর কালাম। এটাই তাদের সর্বপ্রথমে শোনাতে হবে।

আবু রাফে রা. বলেন, আমি দেখেছি, নবিজিকে হাসান ইবনে আলির জন্মের পর তার কানে নামাজের মতোই আজান দিতে।

সন্তানদের ব্যাপারে পিতা-মাতার আসল ফিকির

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. উল্লেখিত আমলের দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার উপর ফরজ এবং সন্তানের অন্যতম হক হলো-সর্ব প্রথম তাদের জন্য প্রকৃত ও স্থায়ী দৌলত এবং আসল কল্যাণ ও কামিয়াবীর ফিকির ও ব্যবস্থা করা অর্থাৎ সন্তানদেরকে কুরআনে কারীম ও দ্বীনে ইসলাম-এর জরুরী বিষয় সমূহ শিক্ষা দেয়া, যে মালিক সব ধরণের নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন, তার যথার্থ বন্দেগী ও গোলামীর জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া, যাতে করে দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর অফুরন্ত নিয়ামতের ভাণ্ডার তাদের জন্য জারী থাকে এবং আসল মালিকের গোলামী ও বন্দেগীর ইলম না থাকায় তাঁর নাফরমানীর দরুন তাদের নিয়ামত সমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হতে না হয় ।

অন্যান্য ব্যাপারে ফিকির

সন্তানকে আসল দৌলত দেয়ার পর তার ব্যাপারে অন্যান্য জায়িয ফিকির করতে নিষেধ নেই । যেমন, সন্তানকে ফরজে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষাদেয়ার পর কেউ যদি সন্তানকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার বানায় বা অন্য কোন জায়িয পেশা শিক্ষা দেয়, তাহলে এর মধ্যে কোন খারাবী নেই।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বপ্রথম নিজের সন্তানকে কুরআন ও সুন্নাহর তালীম দিয়ে দ্বীনদার পরহেজগার বানাতে হবে। তারপরে অন্য সব ব্যাপারে ফিকির করা যাবে। এরূপে স্বীয় সন্তানদের দ্বীন শিক্ষার ব্যাপারে আগে ফিকির করতে হবে। এরপর অন্যদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে ফিকির করবে। নিজের সন্তানদের ব্যাপারে ফিকির না করে এবং তাদেরকে মাহরূম করে শুধু অন্যদের ব্যাপারে ফিকির করা

আম্বিয়ায়ে কিরামের তালীমের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। নিজের সন্তানদের ও পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক ফিকির ও প্রচেষ্টার মধ্যে অনেকগুলো হিকমত আছে।

সর্বাগ্রে নিজের সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার হিকমত সমূহ

প্রথম হিকমতঃ পিতা-মাতার সাথে রক্তের সম্পর্কের কারণে পিতা-মাতার নসীহত সন্তানেরা সহজে এবং তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে। পিতা-মাতার কথাবার্তা, নিয়ম নীতি, জীবন পদ্ধতি সন্তানের জন্য পাথেয় হয়। এ জন্যই পিতা-মাতা দ্বীনদার ও দ্বীনের খাদেম হলে, সন্তানেরাও তাদের মত সে পথের পথিক হয়ে থাকে, আর পিতা-মাতা বেনামাযী ও নাফরমান হলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানরাও সেরূপ হয়ে থাকে। এমন কি কেউ তাদেরকে নামায পড়ার নসীহত করলে বা সৎপথে চলতে বললে তারা তা গ্রহণ করতে চায় না, বরং তারা ভাবতে থাকে বা অনেক ক্ষেত্রে বলে ফেলে যে, নামায-রোযা কোন জরুরী জিনিষ নয়। এগুলো জরুরী হলে আমার জ্ঞানী ও শিক্ষিত পিতা-মাতা অবশ্যই এগুলো করতেন, এগুলোতে তারা কখনো অলসতা করতেন না।

দ্বিতীয় হিকমতঃ পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন কায়িম করতে এর চেয়ে সহজ কোন পদ্ধতি হতে পারে না যে, প্রত্যেকে নিজের সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থদের দ্বীনের তালীমের

ব্যাপারে ফিকির করবে। এরূপে সবাই ফিকির করলে, এর দ্বারা পূর্ণ সমাজ তথা সমগ্র পৃথিবী দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে এবং পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে জান্নাতী পরিবেশ। জান ও মালের পূর্ণ নিরাপত্তা এবং অনাবিল শান্তি। এ জন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أمرهم ويَفْعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ (: التحريم(٦:

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করো।” (সূরা তাহরীম-আয়াত ৬)

অন্য আয়াতে নির্দেশ এসেছে-

(طه ١٣٢: وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها لا تسألك رزقا نحن نرزقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقوى

“তোমরা নিজের পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিতে থাকো এবং নিজেও নামাযের পাবন্দী করতে থাকো। তোমরা অনেক মাল ও দৌলত জমা করবে, এটা আমি তোমাদের নির্দেশ দেইনি; রিযিক তো আমিই তোমাদের দান করবো; জেনে রেখো, কামিয়াবী শুধু মাত্র মুত্তাকীদের জন্যই। তোমাদের ধারণা মত মাল-দৌলত, মিল-ফ্যাক্টরী, বড় বড় পদের মধ্যে কামিয়াবী নেই।” (সুরা ত্বহা, আয়াত **১৩২**)

তৃতীয় হিকমতঃ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির সন্তানাদি ও পরিবারবর্গ চিন্তাধারা ও আমল আখলাকে তার মত না হয় এবং তার রঙ্গে রঙ্গীন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির ওয়াজ-নসীহত অন্যদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। এ জন্যই ইসলামের শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের উত্তরে সাধারণ লোকেরা বলেছিলেন -প্রথমে আপনি স্বীয় গোত্রকে ঠিক করেন তারপর আমাদেরকে বলবেন। পরবর্তীতে দেখা গেছে, ফাতহে মক্কার পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল গোত্র যখন ইসলাম কবুল করে নিয়েছে, তখন মক্কার আশে পাশের সকল গোত্র দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হতে চলেছে।

যেমন-আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

ورأيت النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا (النصر٢ :

“লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করবে” (সূরা নাসর, ২)

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন গোত্র স্বেচ্ছায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে এসে ইসলাম কবুল করায় সে বৎসরের নাম হয়েছে “সানাতুল উফুদ” অর্থাৎ গোত্র প্রতিনিধিদের আগমনের বৎসর।

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফজীলত

ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফজীলত সম্পর্কে নিয়ে কতিপয় কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ উদ্বৃত্ত হলঃ

(১) কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে

ا من أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللأبي ولعنهم وإِنَّهُمْ يَقُولُونَ ن تظاهرون منكم.
منكرا من القول ودورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (عادل(٢:

“যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে বিশ্বাস করবে এবং যাদেরকে দ্বীনী ইলম দেয়া হবে, অর্থাৎ যারা কষ্ট-মুজাহাদা করে ইলমে দ্বীন হাসিল করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করবেন।"

(২) আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

امن هو قالت اناه الممل مساعداً وقائما يحذر الأسرة ويوجو رحمة ربه قُل هل يستوى الَّذِينَ
يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الأكتاب (الزمرة(؟

“বলোতো যারা ইলমে দ্বীন হাসিল করেছে এবং যার কুরানের ইলম হাসিল করেনি, তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে।" অর্থাৎ যারা ইলম হাসিল করেনি। এমনকি উলামায়ে কিরামের সাথে যাদের উঠা-বসা বা কোনরূপ যোগাযোগও নেই তাদের জন্য আল্লাহর যথার্থ গোলামী অসম্ভব। তাই গোলাম হয়ে মালিকের গোলামীর খবর না রাখার

তারা পশু স্তরেরও নীচে অবস্থান করে। তারা কখনো ইলম ওয়ালাদের সমান হতে পারে না।"

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- “দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমার ফরজে আইন।” অর্থাৎ এ ব্যাপারে অবহেলা করলে আল্লাহর দরবারে কোন প্রকার ওজর আপত্তি চলবে না।

(৪) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে কুরআনে কারীম শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।” (বুখারী শরী 3/4)

(৫) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- “আল্লাহ তাআলা য মঙ্গল কামনা করেন, তাকে দ্বীনে ইলম দান করেন।” (বুখারী শরীফ ১/৩৮)

(৬) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- “দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছু অভিশপ্ত। তবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত- বন্দেগী এবং তার জন্য যে উপকরণ অথবা দ্বীনের আলেম কিংবা দ্বীনের তালিবে ইলম অভিশপ্ত নয়।"

(৭) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- “আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। নবীগণ মীরাস সুরে টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা রেখে যাননি, তাঁরা শুধু দী ইলম রেখে গিয়েছিলেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন হাসিল করেছে, সে অনেক বড় দৌলত হাসিল করেছে।”

এখানে শুধু নমুনা স্বরূপ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। জ্ঞানী লোকদের জন্য শুধু ইশারাই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর মূর্খদের জন্য দলীল প্রমাণের পাহাড়ও বৃদ্ধা। সুতরাং এখানে অনেক বেশী হাদীস উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। অন্যথায় এ ব্যাপারে এতবেশী ফজীলত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণীত হয়েছে, যা একত্রিত করলে, মোটা ভলিউমের বৃহৎ কিতাবে পরিণত হবে।

ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার কয়েকটি ফায়দা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) ইলমে দ্বীন শিক্ষার মাধ্যমে খালিক মালিক আল্লাহ তা'আলার পরিচয় লাভ হয়, মানুষ যে আল্লাহর দাস এবং গোলাম, তা সম্যকরূপে জানা যায় এবং গোলাম হিসেবে তার কি যিম্মাদারী ও দায়িত্ব কর্তব্য, তা শিখা যায়। আর এরই মাধ্যমে ইহকাল-পরকালের যাবতীয় কল্যাণ হাসিল হয়। পক্ষান্তরে কুরআন সুন্নাহ এর ইলম ব্যতীত দুনিয়াতে যত প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, এর সবগুলো দ্বারা শুধুমাত্র পশু চাহিদা তথা খানাপিনা ও দৈহিক আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা অর্জিত হয়। এর বাইরে মানুষ যে সৃষ্টির সেরা, বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, মৃত্যুর পর তার সামনে স্থায়ী জগত আসছে, সেখানে জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের চুলচেরা হিসাব দিতে হবে, তারপরে হয় সে স্থায়ী সুখের অধিকারী হবে, নয়তো স্থায়ী ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হবে- এ সব বিষয়ের কোন আলোচনা বা দিক নির্দেশনা দুনিয়াদার ও কাফির মুশরিকদের প্রবর্তিত সেই সকল তথাকথিত শিক্ষার মধ্যে নেই।

মোদ্দাকথা, কুরআন-হাদীস ও দ্বীনের ইলম শিক্ষা দেয় যে, মানুষের দুনিয়াতে আগমনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঈমান ও আমলকে দুরস্ত করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। খানা-পিনা, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার যিন্দেগীর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। বেঁচে থাকার জন্য এগুলোর দরকার আছে বটে, কিন্তু তাই বলে যে এটাই তার জীবনের সব কিছু, এমনটি নয়।

(২) দ্বীনী ইলম দ্বারা প্রকৃত ইযযত ও শান্তি অর্জিত হয়। সূরাহ মুনাফিকুনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- "প্রকৃত ইযযত মুমিনদের জন্য নির্ধারিত।"
সুতরাং ঈমান-আমল ছাড়া বাহ্যিক ও অস্থায়ী ইযযত মিললেও স্থায়ী ও মানুষের অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা হাসিল হয় না। আর ঈমান ও আমল প্রকৃত পক্ষে দ্বীনী ইলম ছাড়া হাসিল করা সম্ভব নয়। চাই সে ইলম মাদ্রাসায় পড়ে শিক্ষা লাভ করুক, বা উলামায়ে কিরামের সাথে উঠা-বসার দ্বারা অর্জন করুক। তেমনিভাবে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে- "একমাত্র কুরআন অনুযায়ী চলার দ্বারা দিলের প্রশান্তি বা প্রকৃত সুখ হাসিল হয়।" সুতরাং একমাত্র কুরআনের ইলম দ্বারা ঈমান ও আমল দুরস্ত করার মাধ্যমেই সুখ শান্তি হাসিল হওয়া নিহিত। অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

"যে সকল নরনারী ঈমান ও আমল দুরস্ত করবে, তাদেরকে হায়াতে তাইয়্যিবা বা মজাদার যিন্দেগী দান করা হবে।" .

সুতরাং দ্বীনী ইলম ও আমল ব্যতীত বাহ্যিকভাবে সুখের সামগ্রী জমা করা গেলেও প্রকৃত সুখ-শান্তি ও দিলের আনন্দ তা দ্বারা হাসিল করা সম্ভব নয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (طه(١٢٤:

"যে ব্যক্তি কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার যিন্দেগী তিক্ত ও কষ্টদায়ক করে দেয়া হবে " (সুরাহ ত্বহা, ১২৪)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

فَلَا تُعْجِكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبهم بها فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وتزهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ

"পাপীদের ধন-জন যেন তোমাদের বিস্মিত না করে। কেননা- আল্লাহ তা'আলা চান যে, ঐগুলোর দ্বারা তাদেরকে দুনিয়াতে আযাবে নিপতিত করেন।" (সূরাহ তওবা, ৫৫)

৩) দ্বীনী ইলম ও আমল এমন দৌলত- যা সব সময় সঙ্গের সাথী হয়ে থাকে এবং সে ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়া থেকে বেনিয়ায (মুখাপেক্ষীহীন) হয়ে যায়। আর তার এমন খুশী ও ইতমিনান (আত্মতৃপ্তি) নসীব হয়, যা কোন রাজা-বাদশাহদেরও নসীব হয় না। তাছাড়া ইলমের কদর আখিরাতে যে কত অত্যাধিক হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে পার্থিব শিক্ষা বা মাল ও দৌলত নেহাত অস্থায়ী। পরকালে তো এগুলোর কোন মূল্যই নেই, এমনকি দুনিয়াতেও মাল-দৌলত যে কোন সময় ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অধিকাংশ পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের চাকুরীর বয়স শেষ হওয়ার পরে তার শিক্ষা ডিগ্রী তেমন কোন কাজে আসে না।

(৪) কেউ দ্বীনী ইলম অর্জনরত অবস্থায় মারা গেলেও সে ব্যক্তি কামিয়াব হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র দরবারে সে ব্যক্তি শহীদ গণ্য হয়, আল্লাহ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। পক্ষান্তরে পার্থিব বিদ্যা অধ্যায়নরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে, তার সবই বিফলে গেল। এ অসম্পূর্ণ বিদ্যার কারণে দুনিয়া বা আখিরতে তার কোন কল্যাণ সাধিত হয় না।

(৫) দ্বীনী ইলমের বদৌলতে একজন নিম্ন খান্দানের সাধারণ মানুষও আম্বিয়া কিরামের উত্তরাধিকারী হওয়ার মহাগৌরব অর্জন করতে পারে এবং নবীওয়ালা মহান দ্বীনী কাজ আনজাম দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে সকল শ্রেণীর মুসলমানদের সরদার হতে পারে। আর পরকালের ভয়াবহ আযাব থেকে বেঁচে সে পরকালীন মহা কল্যাণ লাভে সক্ষম হয়। ইমাম মুহাম্মদ রহ. কে ইন্তিকালের পর জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

তিনি জওয়াব দিলেন, "কবরে আসার পরে আমাকে বলা হলো যে, তুমি কি চাও? আমি বললাম- হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে মাফ করে দিন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ইরশাদ হলো- হে মুহাম্মদ! আমার যদি তোমাকে আযাব দেয়ার ইচ্ছা থাকতো! তাহলে

তোমাকে দ্বীনী ইলম কেন দান করা হয়েছিল? তোমাকে আমার ইলম এজন্য দেয়া হয়েছিল যে, আমি তোমাকে মাফ করতে চাই।”

অপরদিকে দ্বীনকে বাদ দিয়ে শুধু যে পার্থিব বিদ্যা হাসিল করা হয়, তা ফিরআউন, কারূন, হামানের ন্যায় দুনিয়াদারদের উত্তরাধিকার। এ বিদ্যা দুনিয়াতে আল্লাহ্র মনোনীত জাতি তথা মুসলমানদের সরদার বানাতে সক্ষম নয়। তবে হ্যাঁ, মুসলমানদের খাদেম হতে পারে। আর এ পার্থিব বিদ্যা আখিরাতের আযাব থেকেও কাউকে বাঁচাতে পারে না।

(৬) দ্বীনী ইলমের দ্বারা ইসলাম কায়েম হয় এবং পৃথিবীতে ইসলাম টিকে থাকে। কারণ কোন বস্তু সে বিষয়ের পারদর্শী লোক ছাড়া চলতে পারে না। সুতরাং যারা ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব দুনিয়াতে বিদ্যমান দেখতে চায় তাদের জন্য দ্বীনী ইলমের মাদ্রাসা কায়িম করা এবং নিজের সন্তানদের সেখানে তালীম দেয়ার ব্যবস্থা করা জরুরী। শুধু পার্থিব বিদ্যার অধিকারীদের দ্বারা কিছুতেই ইসলাম টিকে থাকতে বা কায়িম হতে পারে না। তারা যদি উলামাদের রাহবারী ছাড়া বাহ্যিক ভাবে ইসলামের নামে কোন কিছু কায়িম করেও ফেলে, তাহলে তা কোন ক্রমেই সহীহ ইসলাম হবে না-যার নমুনা তাদের বিভিন্ন গোমরাহ ও ভণ্ড ব্যক্তিদের প্রবর্তিত নকল ইসলাম। তারা নিজেদের বুঝ মত ইসলামের এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছে, যার সাথে প্রকৃত ইসলামের মিল খুব সামান্যই রয়েছে। এক কথায়, সেটাকে মডার্ণ ইসলাম বা ভেজাল পূর্ণ ইসলাম বলা যেতে পারে, কিন্তু সেটা মদ্বীনার ইসলাম অবশ্যই নয়। আর ঐ ইসলামে বিশ্বাসীদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভূক্ত বলে বিশ্বাস করাও জায়িয হবে না।

(৭) দ্বীনী ইলমের ধারক ও বাহকগণ দুনিয়ার হায়াত তথা পৃথিবীর অস্তিত্বের ধারক। হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে যতদিন দ্বীনী ইলমের একজন চর্চাকারীও দুনিয়ায় থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না বা দুনিয়ার অস্তিত্ব টিকে থাকবে। (বুখারী শরীফ ১/৪১)

বলা বাহুল্য, দুনিয়াদার ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু সমুদয় লোক দুনিয়াতে উন্নতি করার এবং দুনিয়াকে ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে কেবল দ্বীনী ইলমের ধারক বাহকগণের বদৌলতে। পৃথিবীতে যেদিন দ্বীনের চর্চাকারী একজন আলিমও অবশিষ্ট থাকবেন না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে লন্ড ভণ্ড করে দিবেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে। দুনিয়াতে সাধারণ নিয়ম হলো- কোন শহরের অধিকাংশ লোক বিদ্রোহী হলে, সম্পূর্ণ শহরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা রাহমান, অসীম দয়ালু। তাই অধিকাংশ মানুষ তার বিদ্রোহী হলেও তিনি দুনিয়াকে ধ্বংস করবেন না।

তবে হ্যাঁ, যখন সম্পূর্ণ মানুষ বিদ্রোহী হয়ে যাবে, একজনও ফরমাবরদার থাকবে না, তখন তিনি দুনিয়া ধ্বংস করে দিবেন। যদিও সেই মুহূর্তে দুনিয়ার প্রত্যেকটা লোক পার্থিব শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী হোন না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সামান্যতম মূল্যায়ন করে এক সেকেন্ডের জন্যও দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন না।

(৮) দ্বীনী ইলমের মধ্যেই মুসলমানদের পার্থিব কল্যাণ নিহিত। মুসলমানদের জন্য অন্য বেদ্বীন কাফির সম্প্রদয়ের অবস্থার সাথে নিজেদের অবস্থা তুলনা করা ঠিক নয়। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ইত্যাদি কাফির সম্প্রদায় গলদ লাইনে বা মাল- দৌলতের লাইনে মেহনত করে দুনিয়াতে উন্নতি হাসিল করতে পারে ঠিক, কিন্তু দুনিয়ার শুরু থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের দুনিয়ার উন্নতি ও প্রগতি দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যখন তাদের দ্বীনী হালত উন্নত হয়েছে, তখন তাদের পার্থিব অবস্থারও উন্নতি ঘটেছে। এমন কি রাজত্ব-কর্তৃত্ব তখন তাদের পদ চুম্বন করেছে। আর যখন তাদের নিকট দ্বীনী ইলম না থাকায় দ্বীনী হালাত খারাব হয়েছে, তখন তাদের পার্থিব উন্নতি-প্রগতিও খারাব হয়ে গেছে। এমন কি তাদের দ্বীনী হালতের অধঃপতনের সাথে সাথে শত শত বৎসরের রাজত্ব-কর্তৃত্ব কাফিরদের হাতে চলে গিয়েছে এবং তারা তখন কাফিরদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে ও ব্যাপকভাবে মার খেয়েছে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের ঘটনা প্রবাহ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং তা পুরাতন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মাত্র। মুসলিম মিল্লাত কুরআন তা'লীমকে মোল্লাগিরি বা ফকীরি বিদ্যা নাম

দিয়ে এটাকে বাদ দিয়ে যখন খৃষ্টান বিধর্মীদের বিদ্যার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, তখনই তাদের মান-মর্যাদা, ইযযত-সম্মান সবই ভূলুণ্ঠিত হয়ে হিন্দু, ইংরেজ তথা কাফিরদের তোষামোদ প্রিয় ও তাদের গোলামী বা অন্ধ অনুকরণের জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত তাদের এ ভুল না ভাঙ্গবে এবং তারা ইলমের মাধ্যমে ঈমান আমল দুরস্ত না করবে, ততদিন তারা কাফিরদের গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধই থাকবে, দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। তাদের মুক্তির একমাত্র পথ দ্বীনী ইলম ও ঈমান আমলের মিহনতের দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে আসা।

(৯) দ্বীনী ইলমের দ্বারা আপামর মানুষদের পার্থিব কল্যাণ লাভের সাথে সাথে পরকালীন প্রভূত কল্যাণ অর্জিত হয় অর্থাৎ একজন আলেম তার ইলমের দ্বারা মানুষদেরকে দুনিয়াতে কিভাবে তারা সৎভাবে চলবে, কিভাবে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, কিভাবে অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-অবিচার থেকে বেঁচে থাকতে পারবে, কিভাবে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হবে, কিভাবে অন্যের বিপদ-আপদে তার পাশে দাঁড়াবে, কিভাবে অন্যের সার্বিক কল্যাণ কামনায় নিয়োজিত হবে তা শিক্ষা দিতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা যে, একজন আলেম পথভোলা মানুষকে জাহান্নামের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর চির সন্তুষ্টি ও জান্নাতের রাস্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

পক্ষান্তরে দুনিয়াদারদের তা'লীম দ্বারা নিজের পেট-পূজা ও ভোগ বিলাস ছাড়া অন্যকে সৎ ও নীতিবান বানানোর কোন দিক-নির্দেশনা লাভ হয় না। আর তারা সুনাম বা সুখ্যাতির জন্য তাদের ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং লাইন দ্বারা সামান্য কিছু পার্থিব কল্যাণ ছাড়া পরকালীন কোন প্রকার কল্যাণ সাধন করতে পারে না বা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেদিকে তৎপর হয় না। আর এ কথা স্পষ্ট যে, একটা মানুষকে তার শারীরিক রোগ থেকে মুক্তি দেয়া আর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। নিয়ত ও স্বার্থ সংশ্লিষ্টতায় পার্থক্য তো আছেই।

(১০) দ্বীনী ইলম দ্বারা যে ঈমান ও আমলের পরিবেশ গড়ে উঠে, তথা নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, হালাল রিযিক, ন্যায় নীতি, পিতামাতাসহ সকল মানুষের অধিকার আদায় এবং দিলের থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, বখিলী ইত্যাদি দূর করার শিক্ষা লাভ হয় এবং এর মাধ্যমে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠে, এর দ্বারা মানুষে মানুষে হানাহানী, কাটাকাটি বন্ধ হয়ে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক পয়দা হয়ে দুনিয়াতে জান্নাতী পরিবেশ কায়েম হয়, সুখ-শান্তি, জান-মালের নিরাপত্তা ও ইযযত সম্মান হাসিল হয়। বলাবাহুল্য, নামায দ্বারা আল্লাহর সামনে বার বার নিজের ক্ষুদ্রতা প্রমাণিত করার দ্বারা মানুষ বিনয়ী হয়, তার থেকে অহংকার দূরীভূত হয়। আর এটাই ঐক্যের ও সৌহার্দপূর্ণ আচরণের ভিত্তি বা বুনিয়াদ। তেমনি ভাবে রোযা দ্বারা পশু স্বভাব ও উগ্রতা, হিংস্রতা কন্ট্রোল হয় এবং অন্যের দুঃখ বেদনা অনুধাবন করে তাদের সমবেদনা ও সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। অনুরূপ যাকাত দ্বারা বখিলী দুর হয় অন্যের প্রতি কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হয়। আর হজ্বের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের অনন্য ইজতিমার দ্বারা বৃহত্তর ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং একে অন্যের জরুরত ও সমস্যা অবগত হয়ে তার সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। আর হালাল রিযিকের নীতি ব্যবসা-বাণিজ্যে ধোকা ফাঁকি, নকল, ভেজালসহ বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল প্রকার অন্যায় অবিচার ও অনিয়ম তিরোহিত করে। ইসলামের অধিকার আদায় নীতি দ্বারা কোন মুসলমানের দ্বারা অন্য মুসলমানতো দূরের কথা, কোন একজন কাফির-বেদ্বীনও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পথ থাকে না। সুতরাং ইসলামের প্রত্যেক ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের জান্নাত লাভের সাথে সাথে দুনিয়াবী প্রভূত কল্যাণের সমূহ উপকরণ বিদ্যমান। এর দ্বারা সমস্ত জুলুম-শোষণ, ফিনা-বিশৃঙ্খলা বন্ধ হয়ে ইনসাফ ও শৃঙ্খলা ভিত্তিক জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অথচ দুনিয়াদারদের বিদ্যার মধ্যে এ সবের নাম মাত্রও নেই। তারা সুনাম বা পদের লোভে দুনিয়াতে জনসাধারণের সাময়িক কিছু কল্যাণ সাধন করলেও যেখানে তার স্বার্থ নেই বা বদনামী ও শাস্তির আশংকা আছে এমন ক্ষেত্রে তারা অন্যের কল্যাণে কিছু করে না। বরং নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন রূপে অবৈধ কাজ দ্বিধাহীন চিত্তে করে যেতে থাকে।

দ্বীনের ইলম ও দুনিয়ার শিক্ষার মধ্যে উল্লেখিত পর্বত মহাপর্বত ব্যবধান জানা সত্ত্বেও কোন পিতা-মাতা স্বীয় সন্তানকে বৃহৎ কল্যাণের দ্বীনী ইলম থেকে মাহরূম করে। সামান্য পার্থিব স্বার্থের মোহে পড়ে স্বীয় সন্তানদের অমূল্য আমানতী জীবনকে ধ্বংস করার খিয়ানতী সাহস দেখাতে পারেন না। প্রত্যেক মুসলিম অভিভাবকের এ পথে জবাবদিহীতার সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। ইহকালে যাই হোক না কেন, পরকালে তা অবশ্যম্ভাবী।

সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা না দেয়ার ক্ষতি

প্রত্যেক পিতা-মাতার উপর নিজ সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়া ফরজ। যাতে করে সন্তান পিতা-মাতার স্বীয় ঈমান ও আমল-আখলাক রপ্ত করার পাশাপাশি জীবন হায়াতে তাদের খিদমতের হক আদায় করতে সক্ষম হয় এবং তার ইন্তিকালের পর তাদের জানাযার নামায পড়িয়ে বিগলিত অন্তরে মহান আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি করে তাদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে পারে; তাদের কাফন-দাফন সবকিছু সঠিকভাবে সুন্নত মুতাবিক করতে পারে এবং কবরে হাশরে নেক সন্তান পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া হয়ে তাদের নাজাতের উসিলা হতে পারে।

পক্ষান্তরে পিতা-মাতা যদি তাদের এ ফরজ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা অনুযায়ী এটা সন্তানকে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ এবং এটা সন্তানের প্রতি স্পষ্ট জুলুম এবং তার হক ও অধিকার আদায়ে চরম ব্যর্থতা হয়, যার খেসারতে পিতা-মাতা দুনিয়া ও আখিরাতে পদে পদে বিপদ ও আজাবের সম্মুখীন হবে। দুনিয়াতে নিজেদের দ্বীন-ধর্ম দুর্বল হতে হতে শেষ পর্যন্ত বেদ্বীন হয়ে যেতে পারে এবং সন্তানের বদ দ্বীনী আমলের কারণে কবরে হাশরে লা' নত ও আজাবের

পাত্র সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাজত করুন। সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা না দেয়ার দুনিয়াবী ও পরকালীন ক্ষতি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হচ্ছেঃ

দুনিয়াবী ক্ষতিঃ

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

“তোমরা স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে যাচ্ছি।” (সূরাহ আনআম-১৫১)

উক্ত আয়াতের সারমর্ম হলোঃ সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা ও উত্তম চরিত্র গঠন থেকে মাহরূম করা এবং তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া সন্তানকে হত্যা করার শামিল। উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত সন্তানকে হত্যা যে গুরুতর অপরাধ ও কঠোর গুনাহ, তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই, যেমন- আইয়ামে জাহেলিয়াতে সন্তানকে জীবিত কবর দেয়া হতো এবং বর্তমানে উন্নত বিশ্বে সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গড়ার লক্ষ্যে ফ্যামিলি প্লানিং-এর নামে নানাভাবে সন্তানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, তেমনিভাবে সন্তানকে চারিত্রিকভাবে হত্যা করার ব্যাপারটিও এ আয়াতের ব্যাপকতার মধ্যে শামিল। অর্থাৎ সন্তানকে দ্বীনী ও কুরআন শিক্ষা-দীক্ষা না দেয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা। যদ্দরুন আল্লাহ্, রাসুল ও পরকালের ব্যাপারে সে উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে- এটাও সন্তানকে হত্যার চাইতেও গুরুতর। বাহ্যিক হত্যার দ্বারা পিতা এক দোষী সাব্যস্ত হয়, কিন্তু চারিত্রিক হত্যার দ্বারা পিতা-পুত্র উভয়ই দোষী হয় এবং উভয়ের উভয় জগত ধ্বংস হয়। বর্তমানে যারা সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা দিচ্ছে না, বরং তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিচ্ছেন, কিংবা দুচারটা পয়সার লোভে এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দিচ্ছেন-যার ফলে তাদের ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সহীহ আক্বীদা বিশ্বাসের তা'লীম না দেয়ার তারা নাস্তিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বরং অনেক সন্তান বাহ্যিকভাবে মুসলমান দাবী করলেও বাস্তবে ইসলামের গণ্ডির বাইরে চলে গিয়ে জাতীয় বোধ হারিয়ে চারটা পয়সার বিনিময়ে কাফির-খৃষ্টানদের সহযোগী হয়ে দেশ, ইসলাম ও মুসলমানিত্ব ধ্বংসের পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে- এ ধরনের ভ্রান্তির শিক্ষাদাতা পিতা-মাতা নিঃসন্দেহে সন্তানকে হত্যা করার অপরাধে অপরাধী। তাদের মনে রাখতে হবে, বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু চারিত্রিক হত্যা সন্তানের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। সন্তান হত্যার এ অপরাধের কারণে পিতা-মাতা জালিম ও সন্তান মজলুম সাব্যস্ত হয় এবং এ পরিণতিতে আজীবন পিতা-মাতাকে সন্তানের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হতে হয়। অর্থাৎ সন্তানের হক আদায় না করায় সন্তান জালিম হয়ে যায়,

আর পিতা-মাতা নির্যাতিত মজলুম হয়ে জীবন কাটায়। সন্তানের সেবা পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত

হয়। এ সম্পর্কে হাদিসে একটি ঘটনা পাওয়া যায়ঃ হযরত উমর ফারুক রাযি. তখন খলীফাতুল মুসলিমীন। তাঁর আদালতে এক মজলূম পিতা জালিম সন্তানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলো। খলিফা সন্তানকে তলব করে এর কৈফিয়ত চাইলেন। উত্তরে সন্তান জিজ্ঞাসা করলো, হে আমীরুল মুমিনীন! সন্তানের নিকট কি শুধু পিতারই পাওনা বা অধিকার আছে, নাকি পিতার নিকট সন্তানেরও কোন পাওনা আছে? খলীফা জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ, সন্তানেরও পিতার নিকট পাওনা আছে, যথা-সন্তানের খাতিরে

অর্থাৎ সন্তানকে আল্লাহ ওয়ালা বানানোর জন্য পিতার কর্তব্য-দ্বীনদার স্বামীভক্ত কোন রমণীকে বিবাহ করা এবং সন্তান জন্ম নেয়ার পর তার জন্য উত্তম নাম রাখা- যাতে তার চরিত্র সুন্দর হয়। কেননা, নামের তাছির ব্যক্তির উপর পরিস্ফুট হয়ে থাকে। তারপর সন্তান পড়ার বয়সে পৌঁছলে, তাকে দ্বীনী তালীম দেয়া। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, তারপর যখন সন্তান প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে, তখন তাকে দ্বীনদার পাত্র-পাত্রীর সাথে বিবাহ দেয়া। বালেগ হওয়ার পর পিতা-মাতা সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা না করলে, তার চোখ, কান, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ দ্বারা যত প্রকার গুনাহ সংগঠিত হবে, তা সমানভাবে পিতা-মাতার উপরেও বর্তাবে। পিতার নিকট সন্তানের এ অধিকারগুলো জানার পর ঐ জালিম সন্তান বলতে লাগলো- হে আমীরুল মুমিনীন! আমার পিতা তো এর কোন একটি অধিকারও আদায় করেননি। প্রথমতঃ তিনি আমার খাতিরে দ্বীনদার কোন মহিলাকে বিবাহ করেননি। বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখে একটা বেপর্দা চরিত্রহীনা মহিলাকে তিনি বিবাহ করেছেন। তারপর যখন আমি জন্ম নিয়েছি, আমার নাম রেখেছেন জু' উল অর্থাৎ পায়খানার কিড়া। এরপরে যখন আমার বয়স হয়েছে, তখন আমাকে কোনরূপ দ্বীনী তা'লীম না দিয়ে আমাকে কাম- কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। ছেলের এ বক্তব্য যাচাই করে এর সত্যতা উপলব্ধি করে খলীফা এ মামলা খারিজ করে

দিলেন এবং পিতাকে বলে দিলেন-তুমিই প্রথমে নিজের সন্তানের উপর জুলুম করেছো, এর ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।”

এ হাদীস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, জুলুমের পরিণাম সারা জীবন জুলুম ভোগ করা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যারা সন্তানকে দুনিয়ার লোভে দ্বীনী তা'লীম থেকে মাহরূম করছে, তারা দুনিয়া-আখিরাতের কোথাও এ সন্তান দ্বারা লাভবান হতে পারবে না। উভয় জগতে সন্তান তার জন্য মুসীবতের কারণ হবে। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনে, “যখন ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা বাড়বে, তখন কিয়ামতের বড় বড় আলামতসমূহ প্রকাশ পাবে। তন্মধ্যে একটি এই যে, দ্বীনী শিক্ষা বিমুখ সন্তানেরা স্ত্রীর আনুগত্য করবে, আর মায়ের নাফরমানী করবে। অপর দিকে তারা বন্ধু-বান্ধবের খুবই খাতির তোয়াজ করবে, কিন্তু পিতার কোন খোঁজ-খবর নিবে না।” (তিরমিযী শরীফ ২২১৬)

অধুনা অনেক দ্বীনদার পিতা-মাতাকে দেখা যাচ্ছে- তারা তাদের ছেলেমেয়েকে দ্বীনী শিক্ষা দিতে নারাজ। পিতা-মাতা খুবই দ্বীনদার। হাজী সাহেব, তাহাজ্জুদ গুজার ইত্যাদি। কিন্তু ছেলে-মেয়েকে আল্লাহওয়ালা বানানোর কোন ফিকির তাদের নেই। তারা সন্তানদেরকে নির্দ্বিধায় ইংরেজদের হাতে বা ইংরেজদের সিলেবাসে শিক্ষা লাভ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে রেখেছেন। না তাকে ঈমান আমলের কোন তা'লীম দিচ্ছেন, না তাকে নাফরমানী থেকে বাঁচানোর জন্য কোনরূপ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এর পরিণতি এই হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়ের বদ দ্বীনীর কারণে পিতা-মাতার দ্বীনদারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আস্তে আস্তে তাদের দ্বীনদারী সুনাম নষ্ট হয়ে বদনাম শুরু হবেই। সন্তানের কারণেই তার ঘরে টেলিভিশন, ভিসিআর ঢুকবে। ছেলের রূপসী বম্বদ্বীন স্ত্রীর কারণে দ্বীনদারী পরিবেশ নষ্ট হতে থাকবে। সম্পূর্ণ ঘরটা নাচগানের একটা আসর হয়ে যাবে। অনেক লোকের একটা আসর হয়ে যাবে। অনেক লোককে দেখা গেছে- বউয়ের বদদ্বীনী আচরণের কারণে ঘরে বসে ২/৪ রাকা'আত নফল নামায পড়ার মত সুযোগও তাদের

নেই। অথচ এই ঘর বহু কষ্টের বিনিময়ে তিনিই তৈরি করেছেন। কিন্তু আজ তিনি সেখান থেকে বিতাড়িত। অথবা ছেলে-মেয়েদের এসব নাফরমানী নীরবে তাকে সহ্য করতে হচ্ছে। এগুলোকে মনে না চাইলেও তখন তার মেনে নিয়ে "বোবা শয়তানের" উপাধির পাত্র হচ্ছেন।

অন্যায়ের সমর্থন অন্যায়, আর শেষ পর্যন্ত তা অন্যায়েই লিপ্ত করে। অন্যায়ের পরিণতিতে এবং সন্তানের প্রতি মহব্বতের কারণে শেষ পর্যন্ত অনেক পিতা-মাতাও নিজেদের দ্বীনদারীকে বাদ দিয়ে জান্নাতের আয়েশ আরামের কথা ভুলে গিয়ে সন্তান কর্তৃক আমদানিকৃত গুনাহের আসরে শরীক হয়ে দুনিয়াবী হারাম আনন্দ উল্লাসে মত্ত হয়ে উঠেন। (আল্লাহ তা'আলা সকলকে হিফাজত করেন।)
সন্তানের বদদ্বীনীর কারণে পিতা-মাতার দ্বীনদারী নষ্ট হতে পারে, এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা আ. ও খিজির আ.-এর ঘটনার এক স্থানে ইরশাদ করেন,
فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقتلت نَفْسًا زَكية بغيرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْراً (الكهف:

"অতঃপর মূসা ও খিজির আ. চলতে লাগলেন। অবশেষে একটি বালককে দেখতে পেলেন। তখন খিজির আ. উক্ত বালকটিকে হত্যা করলেন। মুসা আ. বললেন- আপনি একটা নিষ্পাপ জীবনকে বিনা কারণে হত্যা করলেন?" (সুরাহ কাহাফ-৭৪) অতঃপর উভয়ের বিচ্ছিন্নতার মুহূর্তে হযরত খিজির আ. পূর্ব ওয়াদা অনুযায়ী তার প্রত্যেকটি আশ্চর্যজনক কাজের ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। তখন বালক হত্যার কারণ উল্লেখ করলেন এই যে, তার পিতা-মাতা ছিলো ঈমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কৃষ্ণর দ্বারা "তার পিতা-মাতাকে প্রভাবিত করবে।

وأَمَّا الْغُلامُ فَكَان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا (الكهف(٨٠ :
সুতরাং তার পিতা-মাতার ঈমানের হিফাজতের লক্ষ্যে আল্লাহ্র নির্দেশে আমি বালকটিকে হত্যা করেছি" (সুরাহ কাহাফ-৮০)

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে উক্ত কারণ এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, হযরত খিযির আ. বালকটির হত্যার কারণ বর্ণনা করলেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল, তার পিতা-মাতা ছিলো নেককার ও ঈমানদার। হযরত খিযির আ. বলেন, আমার আশংকা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে নেককার ও ঈমানদার পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দিবে। সে নিজে কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্যে ফিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালোবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে। (৫/260)

সন্তানকে ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত করলে, পিতা-মাতা অন্তিম শয্যায়ও তার খিদমত থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা পিতা-মাতার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাদেরকে কালিমার তালকীন দিতে পারে না। তাদের পার্শ্বে বসে সুরাহ ইয়াসীন তিলাওয়াত করলে, আছানীর সাথে তাদের রুহ বের হতে পারে। কিন্তু কুরআন বঞ্চিত সন্তান থেকে পিতা- মাতা এ সেবাও লাভ করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু "আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ হচ্ছে- পিতা-মাতার জানাযার নামায তার সন্তান পড়াবে। কারণ- সন্তান যে দিল নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে ক্রন্দন করতে পারে, এটা দুনিয়ার অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়। ইলম বঞ্চিত সন্তান থেকে পিতা-মাতা জানাযার ক্রন্দন ইত্যাদিও আশা করতে পারে না। আর মুর্দাকে কবরে ডান কাতে শোয়ানো জরুরী অর্থাৎ জীবিত মানুষ যেভাবে সুন্নাত তরীকায় ডান কাতে শোয়, মুর্দাকে সে ভাবে শোয়াতে হয়। তার সীনা ও চেহারা সবই কেবলার দিকে রাখা জরুরী। সন্তানকে কুরআনী শিক্ষা থেকে মাহরুম করলে, পিতা-মাতা সঠিক তরীকায় দাফন হওয়া থেকেও বঞ্চিত হয়। তাছাড়া পিতার নাজাত ও মাগফিরাতের জন্য সন্তান কুরআনে কারীমের সহীহ তিলাওয়াত থেকে দুরে রাখলে, তারা পিতা-মাতার ছাওয়াব রিসানীর জন্য কুলখানী, চল্লিশা ইত্যাদি বিদআতী ও হিন্দুয়ানী তরীকার আশ্রয় নিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ তরীকায় পিতা-মাতাকে ছাওয়াব রিসানী করতে সক্ষম হয় না। পিতা-মাতা

তাদের থেকে শরীআত সম্মত পন্থায় কোন উপকার হাসিল করতে পারে না। সন্তানকে দ্বীনী ইলম থেকে মাহরূম রাখার কারণে পিতা-মাতা এভাবে অপুরণীয় বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

পরকালীন তথা কবর ও হাশরের ক্ষতি সন্তানকে ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত রাখলে, উক্ত সন্তান পিতা-মাতার জন্য কবর ও হাশরের ময়দানেও সমূহ বিপদের কারণ হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- "মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার সমুদয় আমল বন্ধ হয়ে শুধুমাত্র তিনটা আমলের ছাওয়াব জারী থাকে। যথাঃ

(১) সদকায়ে জারিয়া, যেমন- রাস্তাঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা-তৈরী করে দেয়া।

(২) ইলম দ্বীন রেখে যাওয়া, যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হতে থাকে। যেমন-দ্বীনী কিতাব পত্র সহজ সরল ভাষায় লিখে গেল, যার দ্বারা সাধারণ লোকেরা দ্বীনের বুঝ হাসিল করলো।

(৩) দ্বীনদার ও নেক সন্তান রেখে যাওয়া, যে তার জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে।

সন্তানের দু'আর উসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা তার পিতাকে মাফ করে দেন এবং সন্তান দুনিয়াতে যত নেকী করতে থাকে, লোকদেরকে কুরআনের তা'লীম দিতে থাকে, সন্তান পিতা-মাতার জন্য দু'আ করুক আর নাই করুক, যেহেতু পিতা-মাতা সন্তানকে দ্বীনী তা'লীম দিয়েছেন এ জন্য তারা সন্তানের সমস্ত নেকীর মধ্যে শামিল হয়ে যান। অথচ সন্তানের নেকী কম করা হয় না। এভাবে দেখা যায়- মৃত্যুর সময় হয়ত তার গুনাহের পাল্লা ভারী ছিল, কিন্তু সন্তানদের নেক আমল যোগ হতে থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত তার নেক নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যায় এবং তার মাগফিরাত ও নাজাত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে পিতা-মাতা যদি সন্তানকে দ্বীনী তা'লীম না দেয়, তাহলে ঐ সন্তান পিতা-মাতার জন্য ছাওয়াব রেসানী করতে পারে না। সমস্যা শুধু এতটুকু নয়, বরং ঐ সন্তান শরী'আতের ইলম না রাখার দরুন তার দ্বারা যত ধরনের অন্যায় অপরাধ সংগঠিত হতে থাকে, তাকে ইলম দ্বীন থেকে মাহরূম রাখার অপরাধের দরুন পিতা মাতা তার প্রত্যেকটি অন্যায়েরে গুনাহর মধ্যে শরীক হতে থাকেন। যেমন- ধরুন, ইলমে দ্বীন না থাকার দরুন সন্তানের হালাল-হারামের ব্যাপারে কোন ধারণা অর্জিত হয় না, হারাম রিযিকের কুফল সম্পর্কে তার সম্যক জ্ঞান থাকে না। সে জানে যে, হারাম রিযিক দ্বারা যে শরীরকে প্রতিপালন করা হয়, সে শরীরের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান, সুদের একটি দিরহাম/টাকা গ্রহণ করা ৩৬ বার যিনার সমতুল্য অপরাধ। তার চেয়ে মারাত্মক কথা, সুদের লেন-দেন ত্যাগ না করলে, তাকে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সবের নির্ঘাত পরিণাম ঈমান হারা হয়ে মৃত্যুবরণ করা। এসবের ইলম তাকে শিক্ষা না দেয়ার দরুন সে অবাধে সুদ-ঘুষ গ্রহণ করতে থাকে; আরো নানাবিধ অন্যায়ের মধ্যে সে জড়িত হয়ে পড়ে, যেমন- সিনেমা, টিভি, ভিসিআর, নাচ, গান ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে পরে। এমন কি অনেকে মদ ও জুয়াতেও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

আর কোন কোনো দুর্ভাগ্য তো ঈমান-ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্টান-নাস্তিক পর্যন্ত হয়ে যায়। এসব অন্যায় অপরাধের জন্য যেহেতু তার পিতা-মাতা কারণ, যেহেতু তার সন্তানের হক আদায় করেনি, তাদের সহীহ ইলম শিক্ষা দেয়নি, তাই তারা সন্তানের সকল গুনাহের মধ্যে শরীক হয়ে যায়। এমনকি মৃত্যুর সময় হতে পারে যে, তার গুনাহই কম ছিল, কিন্তু এ ধরনের দ্বীন বিমুখ ২/৪ টি সন্তান রেখে যাওয়ার দরুন তাদের সমস্ত অন্যায়ের সমষ্টি পিতা-মাতার আমল নামায় যোগ হতে থাকল। তখন তার গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে গেল এবং কবরের ভয়াবহ আযাবে পাকরাও হয়ে গেল। তদুপরি সন্তানদের অন্যায় যতই বাড়তে থাকে। তাঁর আযাবও ততই বাড়তে থাকে। সে ব্যক্তি সন্তানের মায়ায় নিজের সম্পত্তি থেকে মসজিদ-মাদ্রাসা ও কুরআন কারিমের

জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করেনি। অথচ সেই সম্পত্তি তার সন্তানরা তার ছাওয়াব রেসানীর জন্য দ্বীনী কাজে ব্যয় না করে বিভিন্ন অন্যায় ও হারাম কাজে ব্যয় করতে থাকে। আর শাস্তি তাদের পিতা মাতা কবরে ভোগ করতে থাকে। এভাবে কিয়ামতের পর্যন্ত পিতা মাতা একদিকে নিজের অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে থাকে, অপর দিকে সন্তান তথা দ্বীনী শিক্ষা বিমুখ ছেলে-মেয়েদের অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করতে করতে নিষ্পেষিত হয়। দুঃখ-যাতনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ, অপমান-অপদস্থ হওয়া ছাড়া আর কিছু তাদের ভাগ্যে জুটে না। এরপরে যখন কিয়ামত কায়েম হবে এবং হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ বিচারের জন্য একত্রিত হবে, তখন ঐ পিতা-মাতা চোখের সামনে এ জাতীয় সন্তানের কারণে পূর্বের চেয়ে আরো মারাত্মক পরিস্থিতি লক্ষ্য করবে।

একদিকে নিজের অপরাধের কারণে দিশেহারা। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে না; বরং সকলেই ভাগতে থাকবে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানের হক নষ্ট তথা দ্বীনী ইলম থেকে তাকে মাহরুম করার দরুন কৈফিয়ত তলব করবেন, অপরদিকে সন্তানের হক নষ্ট করে তাদের দ্বীনী ইলম থেকে বঞ্চিত করে যে হত্যা তাদেরকে করা হয়েছে, হাশরের ময়দানে ঐসব হত্যাকৃত সন্তানেরা আল্লাহ্র দরবারে এই বলে মামলা দায়ের করবে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় (তারা বলবে-)

وقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادتنا وكبراءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاً (٦٧) ربَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعنهم

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও সর্দারদের এবং বড়দের তথা পিতা-মাতার কথা মেনেছিলাম। কিন্তু তারা আমাদেরকে (কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা না দিয়ে বরং দ্বীন বিমুখ ভ্রান্ত বিষয়ের শিক্ষা দিয়ে) পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের উপর লানত, মহা অভিসম্পাত নাযিল করুন।” (সূরাহ আহযাব, ৬৯)

চিন্তা করুন, যে সন্তানের জন্য হাজার হাজার টাকা নির্দ্বিধায় পানির মত ব্যয় করা হলো, দুনিয়াতে তো তার দ্বারা কোন খিদমত পাওয়া গেলই না মৃত্যুর সময় সুরাহ্ ইয়াসীন তিলাওয়াত, কালিমার তালকীনও করতে পারলো না, পিতা-মাতার জানাযা

পড়াতেও সক্ষম হলো না, সহীহ তরীকায় পিতা-মাতার কাফন-দাফনও করতে পারলো না, কবর যিয়ারত, সাওয়াব রেসানীও করতে পারলো না। বরং কবর আযাব বৃদ্ধির কারণ হলো এবং হাশরের ময়দানে পিতা-মাতার বিরুদ্ধে হত্যা কেসের মামলা দায়ের করলো। তারা যতটুকু-শাস্তির উপযুক্ত ছিলো, সেই শাস্তিকে দ্বিগুণ করবার জন্য এবং লানত নাযিল করার জন্য আল্লাহর দরবারে দরখাস্ত করলো।

এসব পিতা-মাতা নেক সন্তানের মহাদৌলত ও মহা সুফল থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হলো এবং সন্তানের কারণে ভয়াবহ আযাবের স্থান জাহান্নামের উপযুক্ত সাব্যস্ত হলো। তাদের যিন্দেগী একেবারে বরবাদ হয়ে গেলো। সন্তানের জন্য তারা প্রচুর মেহনত করেছে বটে, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ বাদ দিয়ে গলত তরীকায় মেহনত করার দরুন তাদের জীবন ষোল আনাই বৃথায় পর্যবসিত হল। সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা থেকে মাহরুম করার দরুন একদিকে তারা পিতা-মাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবে, অপরদিকে যার সুপারিশ ব্যতীত হাশরের ময়দানে নাজাতের কোন সুরত থাকবে না, সেই রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফীউল মুজনিবীন আখিরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও সন্তানকে, কুরআনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে দুনিয়াতে কুরআন কায়িম করার প্রচেষ্টা না করার দরুন পিতা-মাতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (الفرقان(٣٠:

“নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র দরবারে অভিযোগ করবেন, “হে আমার পালনকর্তা! আমার সম্প্রদায় পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাগ করে রেখেছিল।” (সূরাহ ফুরকান, ৩০)

কুরআনকে পরিত্যাগ করার বাহ্যিক অর্থ-কুরআনকে অস্বীকার করা যা কাফিরদের কাজ। কিন্তু রিওয়ায়াত দ্বারা একথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কুরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তিলাওয়াত করে না এবং এর উপর আমল করে না। (আমলের মধ্যে ঈমান নামাযের সাথে একথাও আছে যে, সন্তানদের কুরআনের তালীম দিয়ে কুরআনকে বিশ্বের বুকে স্থায়ীভাবে কায়িম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলমান হয়ে যারা কুরআনের উপর আমল করে না, কুরআনকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করে না, তারাও এ অভিযোগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসামী সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সন্তানদেরকে শুধু পিতা-মাতার দুনিয়া সাজানোর উদ্দেশ্যে দেননি। বরং আল্লাহ্ তা'আলার মহান উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতা সম্পূর্ণ আল্লাহর মেহেরবানীতে যে সন্তান লাভ করে- তাদেরকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এবং আল্লাহ্র যমীনে কুরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কুরআনী শিক্ষায় শিক্ষিত করবে।

সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা না দেয়া আল্লাহর এ মহা নিয়ামতের নাশোকরী ছাড়া আর কিছুই নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তদীয় সাহাবাগণ রাখি কত ত্যাগ, কুরবানী ও শাহাদতের বিনিময়ে এ কুরআন কায়িম করেছেন এবং পরবর্তী লোকদের নিকট আমানত রেখেছেন, যেন তারা নিজেরা কুরআন শিক্ষা করে নিজের সন্তানাদি ও পরিবারের সকলকে কুরআন শিক্ষা দিয়ে কুরআনের এ আমানতকে সংরক্ষণ করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যমীনে- কুরআন কারিম রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তথা মসজিদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করে এবং সেখানে কুরআন শিক্ষার জন্য নিজের সমস্ত সন্তানদের প্রেরণ করে ও অন্য ভাইদেরকে তাদের সন্তানকে কুরআনী শিক্ষা দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

মুসলমানরা দুনিয়ার চারটা পয়সার লোভে সামান্য কয়েকদিন দুনিয়াতে ফুর্তি করার মোহে যদি সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা থেকে মাহরূম করে রাখে, তাহলে এটাই তাদের বড়

শাস্তি যে, স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র দরবারে নালিশ ও মামলা দায়ের করবেন।

এখন প্রত্যেকে নিজের বুকে হাত দিয়ে নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন-কুরআন কারিম করার জন্য সন্তানদের কুরআনী শিক্ষা দিয়েছেন কি না এবং কুরআনকে সংরক্ষণের জন্য মাদ্রাসা কায়িমের ব্যাপারে কতটুকু ভূমিকা বা অবদান রেখেছেন? যদি এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাহলে আল্লাহ্র শোকর আদায় করুন। আর দায়িত্ব পালন না করে থাকলে! নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নালিশ মামলা থেকে বাঁচার জন্য কি ব্যবস্থা করবেন, তা উলামায়ে কিরাম থেকে জেনে নিয়ে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র দুনিয়া; আখিরাত তো ফল ভোগের স্থান। সেখানে সমস্যা সমাধানের কোন উপায় নেই।

সন্তানরা পিতা-মাতার বেহেশত-দোযখের সামান

বাস্তবিক পক্ষে সন্তানকে কুরআন শরীফ এবং ইলম শিক্ষা দেয়া পিতামাতার জন্য সবচেয়ে বড় কামিয়াবী। এ ধরণের পিতা-মাতা অন্য পিতা-মাতার তুলনায় প্রকৃতপক্ষেই ভাগ্যবান। তারাই সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যশালী। দুনিয়ায় আসার পর প্রত্যেকের সামনে তিনটি জগত বিদ্যমান থাকে। যথাঃ আলমে দুনিয়া, আলমে বরযখ (কবরের যিন্দেগী) এবং আলমে আখিরাত। যে সমস্ত পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরকে কুরআনে কারীম এবং দ্বীনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে শুধুমাত্র অস্থায়ী জগতের রুটি-রুজীর জন্য পার্থিব বিষয়াদি শিক্ষা দেয়, তারা সন্তানের দ্বারা শুধুমাত্র দুনিয়াতে যৎকিঞ্চিত উপকৃত হতে পারে। সেটাও নিশ্চিত নয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তীতে আসছে। কিন্তু ঐ সন্তানের দ্বারা তারা কবরের যিন্দেগীতে এবং আখিরাতের যিন্দেগীতে কোন উপকার পাওয়ার আশা করতে পারে না। বরং সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার ফরজ দায়িত্ব তরক করার দরুন এবং ইলমে দ্বীন বঞ্চিত সন্তানের সকল অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতির গুনাহে অংশীদার হওয়ার দরুন প্রত্যেক ঘাটিতে সেই পিতামাতা আটকা পড়বে এবং

আযাব ও গযবের সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে যারা সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করবে, তারা দুনিয়াতে, কবরে ও আখিরাতে কামিয়াব হবে। সকল স্থানে সন্তানের উসীলায় সুখ-শান্তি ও আরাম ভোগ করবে। পবিত্র কুরআন-হাদীসের ভাণ্ডারে পিতা-মাতার সম্মান, কদর এবং তারা সন্তানের জন্য কত বড় নিয়ামত-এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে, যা একত্র করলে কয়েক ভলিয়মের একটি রিরাট কিতাব প্রস্তুত হয়ে যাবে। এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। এসব আলোচনা পার্থিব শিক্ষার লাইনে না থাকার দরুন ঐ সব লাইন পড়ার পর একটি সন্তান জানতেই পারে না যে, তার পিতামাতা কত বড় নিয়ামত আর তাদের হকই বা কি কি।

সন্তানকে উত্তম তারবিয়া দেওয়ার উপকারিতা ও ফলাফল

প্রথম উপকারিতা : পিতা-মাতার বাধ্যগত হওয়া

পিতা-মাতার দীর্ঘ প্রচেষ্টা এবং উত্তম তারবিয়ার পর নিশ্চয় ফলাফলও ভালো আশা করা যাবে। আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তানগুলো নেককার হবে, পিতা-মাতার প্রতি অনুগত এবং আল্লাহর নির্দেশগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হবে। এই পিতা-মাতা জীবদ্দশায় নেককার সন্তানাদি পাবেন; যারা পিতা-মাতার সেবা করবে এবং তাদের প্রতি আন্তরিক থাকবে। কবি বলেন, আমাদের সন্তানরা তাতেই গড়ে উঠবে,

যাতে তাদের বাবারা অভ্যস্ত করে তুলবে।

মৃত্যুর পরে নেককার সন্তানাদি পিতা-মাতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। এটা সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, মৃত্যুর পর মানুষের সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিন প্রকার আমাল ছাড়া। (অর্থাৎ তিন প্রকার আমলের সওয়াব জারি থাকে)। ১. সদাকাহ জারিয়াহ (অব্যাহত উপকার পাওয়া যায় এমন দান) ২. উপকারী ইলম ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দুআ করতে থাকে।

প্রতিটি নেক সন্তানের পিতা-মাতার জন্য এটি আল্লাহর বিশেষ একটি অনুগ্রহ। নেক সন্তান জীবদ্দশায় পিতা-মাতার অনুগত হয়। মৃত্যুর পরেও কাজে আসে। পিতা-মাতার আনুগত্য সম্পর্কে প্রচুর আয়াত ও হাদিস রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য আয়াত হচ্ছে এই,

“তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে 'উফ্‌ফ' বলবে না এবং তাদের ধমক দেবে না; বরং তাদের সঙ্গে

নম্র কথা বলবে। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে এবং বলবে, হে আমার প্রতিপালক! যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন তেমনি তাদের প্রতি দয়া করুন।”

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাঁর ইবাদতের কথা বলেছেন। এরপরেই বলেছেন পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে। তাদের সঙ্গে কষ্টদায়ক কোনো আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি সামান্য ‘উফ' শব্দও বলা যাবে না। এছাড়া পিতা- মাতাকে ধমক দিতেও নিষেধ করেছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, পিতা-মাতার সাথে কোনো ধরনের মন্দ আচরণ করা যাবে না। আতা রহ. বলেন, এই আয়াত থেকে এটাও বোঝা যায়, পিতা-মাতার ওপর হাত উঠানো যাবে না।

এরপর আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন পিতা-মাতার সঙ্গে নম্র কথা বলতে, সদয় আচরণ করতে এবং তাদের সামনে বিনয়ী হয়ে যেতে। পিতা-মাতার অনুগত হওয়া এবং তাদের প্রতি সদয় হওয়া প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আল্লাহর রাসুল! আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? রাসুল বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবিজি বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস, তারপর কে? রাসুল বললেন, তোমার মা। লোকটি আবার জানতে চাইল এরপর কে? রাসুল বললেন, এরপর তোমার বাবা।

অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসুল ওই লোকের প্রশ্নের জবাবে বলেন, তোমার না। তারপরও তোমার মা। তারপরও তোমার মা। এরপর তোমার পিতা। অতঃপর তোমার নিকটবর্তী জন। এরপর পরবর্তী নিকটবর্তী জন।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, সর্বোত্তন সদ্ব্যবহার হলো, পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা।

আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, যে ব্যক্তি চায়, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা মৃত্যুর পরে তার সুনাম বজায় থাকুক, তবে সে আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করুক।

এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায়, সন্তানের ওপর পিতা-মাতার হক সম্পর্কে। তবে ইসলামি শিষ্টাচারের ওপর বেড়ে ওঠা সন্তানাদি শরিয়া নির্দেশিত এই হকগুলো সাধারণত পালন করে। সুতরাং এই হক পালন করাটা মূলত ওই পিতা-মাতার তারবিয়ার শুভ পরিণাম হিসেবে যারা সন্তানদের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়ে তুলেছেন।

কবি বলেন, শিষ্টাচারের শিক্ষাদান উপকারী হয় ছোটোকালে, কোনো কাজে আসে না সেগুলো বড়ো হলে। গাছ যখন ছোটো থাকে তখনি হয় সোজা, আর সোজা করতে পারবে না বড়ো হলে।

সুতরাং যে সন্তানকে ছোটো থেকেই তার পিতা-মাতা আল্লাহর আনুগত্যে গড়ে তুলবে, আল্লাহ ইচ্ছায় বড়ো হলে ওই সন্তান নেককার হবে। সন্তান সৎ ও নেককার হওয়ার কারণে বাবা-মা-ও প্রভূত কল্যাণ, সওয়াব এবং প্রতিদান লাভ করবে। কারণ, সৎকর্মশীলদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা নষ্ট করেন না। যেহেতু এই পিতা- মাতা সন্তানদের শৈশবকালে উত্তম তারবিয়া দিয়েছেন; আল্লাহ তাআলা তাদের ওই ভালো কর্মের প্রতিদান নিশ্চয়ই নষ্ট করবেন না; বরং বাড়িয়ে দেবেন। তাদের জন্য উপকারী বানিয়ে দেবেন; তাদের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর। বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ থেকে এ কথাই বুঝে আসে।

দ্বিতীয় উপকারিতা : সত্যিকারের পৌরুষ ও নারীসহ সন্তানাদি গড়ে উঠা ভালো তারবিয়ার একটি উপকারিতা হলো, ছেলে-মেয়ে গড়ে উঠবে নেককাররূে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে মেনে চলবে। সুউচ্চ ও সমুন্নত চরিত্র মাধুরীর অধিকারী হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লান নারীদের বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের ওপর লানত বর্ষণ করেছেন। আরেক বর্ণনায় এসেছে, নবিজি নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের ওপর অভিসম্পাত করেছেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি লানত করেছেন নারীর মতো পোশাক পরিধানকারী পুরুষের ওপর এবং পুরুষের মতো পোশাক পরিধানকারীনী নারীর ওপর।

উত্তম তারবিয়াপ্রাপ্ত সন্তানদের আমরা দেখি না উপরিউক্ত হাদিসে উল্লেখিত নিকৃষ্ট পথে চলতে; বরং যারা উত্তম তারবিয়া পায়নি তাদেরই দেখা যায় এ ধরনের পথ অবলম্বন করতে। ইসলামি তারবিয়াপ্রাপ্ত সন্তানদের দেখা যায়, তারা নিজেদের পৌরুষ বজায় রাখে। তারা নারী কিংবা পাপাচারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে না। পক্ষান্তরে ইসলামি তারবিয়ার ছোঁয়া পায়নি এমন লোকদের বাঁকা পথ অবলম্বন করতে দেখি।

অতএব সচেতন ও নেককার মুরব্বির উত্তম তারবিয়ায় নেককার ছেলে-মেয়ে গড়ে ওঠে। তারা শরিয়া পালনে যত্নবান হয়। তাদের মাঝে ইসলামি শিষ্টাচার, প্রশংসনীয় স্বভাব- চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটে। পুরুষ হলে বজায় থাকে তার পরিপূর্ণ পৌরুষ। নারী হলে পূর্ণ নারীত্বের ওপর বহাল থাকে। কারণ, আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল মুসলিমদের বাধ্য করে সর্বদা প্রশংসনীয় চরিত্রে অটল থাকতে।

কবি বলেন, পুরো বছরে যদি নির্জনতা পাও তুমি একদিন, ভেব না কেউ নেই, একজন ঠিকই দেখছেন। আল্লাহকে কখনো গাফেল ভেবো না তুমি। তাঁর কাছে কিছুই লুকোতে পারবে না তুমি।

তৃতীয় উপকারিতা : সন্তানাদি প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়া। উত্তম তারবিয়ার অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে, সন্তানেরা শরিয়া-নির্দেশিত প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী হবে।

নবিজি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর চরিত্রের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,
وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
অর্থ : আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

আরেক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে,
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.
অর্থ : আপনি যদি রূঢ় ও কঠোর হৃদয়ের হতেন তবে আশপাশ হতে তাঁরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম) সরে পড়তো।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ মুমিন হচ্ছে ওই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম। তোমাদের সর্বোত্তম তারাই যারা নিজেদের স্ত্রীদের কাছে সবচেয়ে ভালো

নাওওয়াস ইবনে সামআন রা. থেকে বর্ণিত, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে আমি নবিজিকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, সদাচরণই পুণ্য। আর পাপ হলো সেটা যেটা করতে তোমার দ্বিধা হয়, আর তুমি চাও না যে, লোকে তা জানুক।

আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, যেখানেই থাকো না কেন তুমি সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে। কোনো গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে একটি নেককাজ করবে। তা হলেই গুনাহটি মোচন হয়ে যাবে। মানুষের সাথে সদাচরণ করবে।`

আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত দিবসে মুমিনের দাঁড়িপাল্লায় সচ্চরিত্র ও সদাচারের চেয়ে ভারী আর কোনো আমল হবে না। আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও কটুভাষীকে ঘৃণা করেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজিকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন জিনিসের কারণে মানুষ সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে? রাসুল বললেন, আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্র। আরও জিজ্ঞেস করা হলো, কোন বস্তুর কারণে মানুষ সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে? উত্তরে নবিজি বললেন, দুটি অঙ্গ, মুখ এবং লজ্জাস্থান।

আবু উমামা বাহিলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ন্যায়ের ওপর থেকেও যে লোক ঝগড়া পরিহার করবে তার জন্য আমি জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের জিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তামাশাচ্ছলেও মিথ্যা বলে না আমি জান্নাতের মাঝখানে তার জন্যে একটি ঘরের জিম্মাদার। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে আমি তার জন্যে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘর দেওয়ার দায়িত্ব নিলাম।

নেককার পিতা-মাতা উপরোল্লেখিত চরিত্র মাধুর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত হন। এছাড়াও তাদের মধ্যে থাকে অন্যান্য উত্তম গুণাবলি। যেমন, বিনয়, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, বিশ্বস্ততা, অবিচলতা, সাহসিকতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা, কোমলতা, তাকওয়া, লজ্জাশীলতা, পরহেজগারিতা, আল্লাহর ওপর ভরসা, দয়া, ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ। নেককার পিতা-মাতার থেকে উত্তম তারবিয়াপ্রাপ্ত সন্তানেরাও গুণান্বিত হয় এ সকল

গুণে। কবি বলেন, উম্মতের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন, তাদের চরিত্র ঠিক থাকবে যতদিন।

চতুর্থ উপকারিতা : রক্ষণশীল একটি মুসলিম পরিবার তৈরি হওয়া

সৎস্বভাবের অন্যতম শুভ পরিণাম হচ্ছে, নেককার এবং অন্যকে সংশোধনকারী একটি পরিবার প্রস্তুত হওয়া। আর গোটা প্রজন্মের জন্য আদর্শ পরিবার হচ্ছে, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার আল্লাহ প্রদত্ত হৃদ্যতা ও ভালোবাসা বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার বড়ো একটি নিয়ামত। সেই সঙ্গে এটি আল্লাহর কুদরত এবং অলৌকিকতার বড়ো একটি নিদর্শন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْن.َ

অর্থ : তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রী। যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অনেক শিক্ষা।

নেককার পিতা-মাতা উপরোল্লেখিত চরিত্র মাধুর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত হন। এছাড়াও তাদের মধ্যে থাকে অন্যান্য উত্তম গুণাবলি। যেমন, বিনয়, সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, বিশ্বস্ততা, অবিচলতা, সাহসিকতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থিরতা, কোমলতা, তাকওয়া, লজ্জাশীলতা, পরহেজগারিতা, আল্লাহর ওপর ভরসা, দয়া, ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ। নেককার পিতা-মাতার থেকে উত্তম তারবিয়াপ্রাপ্ত সন্তানেরাও গুণান্বিত হয় এ সকল গুণে। কবি বলেন, উম্মতের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন, তাদের চরিত্র ঠিক থাকবে যতদিন।

এই হৃদ্যতা ও ভালোবাসার মাধ্যমেই স্থায়ী-সুখী একটি পরিবার গড়ে ওঠে। যার ছায়াতেই বড়ো ব্যক্তিত্ব বেড়ে উঠেন। ইসলামি দাওয়াতের ইতিহাস নিয়ে কেউ গবেষণা করলে জানতে পারবে শক্তিশালী পরিবার-ব্যবস্থার কারণে কী কী সম্ভব। হয়েছে! আর কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বৈবাহিক সম্পর্কটাকেই ইসলাম গণ্য করেছে মুসলিম পরিবারের ভিত্তিমূল হিসেবে।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, আল্লাহ যাকে একজন পুণ্যবতী স্ত্রী দান করলেন তাকে সহযোগিতা করলেন। অর্ধেক দ্বীন পালনে। বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে আল্লাহকে ভয় করুক।

নেককার পুরুষ ও নারীর মাঝে বিয়ের পর থেকে তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে একটি ইসলামি পরিবার। আর সেই পরিবার থেকেই সন্তানেরা ইসলামি তারবিয়া লাভ করবে। ফলশ্রুতিতে এমন নেককার পরিবার থেকেই সূচনা হবে ভালো একটি সমাজের। যে সমাজের সদস্যগণের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা পূর্ণ সম্পর্ক থাকবে। তারা ব্যাপৃত হবে তাদের সৃষ্টিগত দায়িত্ব পালনে।

আর সেই দায়িত্বটি হলো, আল্লাহ পাকের ইবাদত করা। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা।

মুমিন সব সময় আল্লাহ তাআলার কাছে নেক সন্তান প্রার্থনা করবে। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.

অর্থ : যারা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দান করুন নয়নপ্রীতিকর স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। আর আমাদের বানান মুত্তাকিদের জন্যে অনুসরণযোগ্য।

আল্লাহর কাছে মুমিনদের এই দুআর বদৌলতে আল্লাহ তাদের হিদায়াত ও সন্তানাদি দান করেন এবং তাদের সন্তানদের তারবিয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। সেখান থেকেই তৈরি হয় মজবুত মুসলিম একটি পরিবার। যে পরিবারের সদস্যরা পারস্পরিক ভালোবাসা, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতায় হয়ে থাকে এক দেহের মতো। আর দেহের কোনো একটি অঙ্গে ব্যথা হলে সেটা অনুভব করতে পারে অন্য সকল অঙ্গই। (তেমনি পরিবারের কোনো সদস্যের কিছু হলে এগিয়ে আসে অন্য সবাই।) তারা হয় সীসাঢালা প্রাচীরের মতো; যে প্রাচীরের ইটগুলো শক্তিশালী করে একে অপরকে। (তেমনি সেই পরিবারের সদস্যরা শক্তি পায় একে অপরের মাধ্যমে।) ওই লোকগুলো নিজেদের জন্য যা পছন্দ করে অন্য মুসলিম ভাইদের জন্যও তাই পছন্দ করে। এছাড়াও সেসব লোকের মধ্যে পাওয়া যায় পাক্কা মুসলিম পরিবারের বিভিন্ন গুণাবলি।

পঞ্চম উপকারিতা : সন্তানদের মাঝেও ভালোবাসার বিস্তার ঘটা

উত্তম তারবিয়ার অন্যতম ফায়দা হলো, সন্তানদের পরস্পরের মধ্যেও ভালোবাসা তৈরি হওয়া। আর এর কারণ হলো, তারা বেড়ে উঠে আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্যে। আর আল্লাহর আনুগত্যকারী লোক নিশ্চয়ই তাই ভালোবাসবে যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল ভালোবাসেন এবং ঘৃণাও করবে সেটাই যেটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কাছে

ঘৃণিত। আল্লাহই নির্দেশনা দিয়েছেন পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং দয়া ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করতে। উত্তম তারবিয়াতে গড়ে ওঠা সন্তানাদি অবশ্যই আল্লাহর এই নির্দেশ পালন করবে। (এই কারণে তাদের মাঝে হৃদ্যতা ও গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে)।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ইমানের স্বাদ আস্বাদন করবে :

১. যার কাছে অন্য সব কিছু থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অধিক প্রিয় হবে।

২. কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে।

৩. . কুফুরিতে প্রত্যাবর্তন করাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মতো অপছন্দ করবে।

আবু উমামা বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, আল্লাহর জন্যেই যে লোক ভালোবাসল ও ঘৃণা করল এবং আল্লাহর জন্যেই যে ব্যক্তি দান করল এবং বিরত রইল (দান থেকে) তার ইমান পরিপূর্ণ।

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, ইমানের সবচাইতে শক্তিশালী রজ্জু হচ্ছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও তাঁর জন্যেই ঘৃণা করা।

সত্যিকারের মুমিন বান্দা হচ্ছে সে-ই যে আল্লাহর পছন্দনীয় কাজে খুশি হয় এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজে রাগান্বিত হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পছন্দনীয় কাজগুলো পছন্দ করে। ঘৃণা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে ঘূর্ণিত কর্মগুলো। সম্পর্ক বজায় রাখে আল্লাহর ওলিদের সাথে এবং শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহর রাসুলের শত্রুদের প্রতি। এটাই হচ্ছে ইমান পরিপূর্ণ হওয়ার আলামত।

ইরশাদ হয়েছে,

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَان.

অর্থ : (হে নবি!) আপনি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসীদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না। হোক না সেই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা জ্ঞাতি- গোত্র। আল্লাহ তাদের অন্তরে ইমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন। উত্তম তারবিয়ার উপকারিতা অপরিসীম। উত্তম তারবিয়ার ফলে সন্তানাদির মধ্যে থাকে পারস্পরিক হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা। তাদের ভালোবাসা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী সবাইকেই তারা ভালোবাসে। তাদের ভালোবাসা এবং ঘৃণা সবই হয় আল্লাহর জন্য।

মন্দ তারবিয়ার ক্ষতিসমূহ

প্রথম ক্ষতি : পিতা-মাতার অবাধ্যতা

যেসব পিতা সন্তানদের ইসলামি তারবিয়া দিতে পারেনি তারা খুব শীঘ্র কর্মফল দেখতে পাবে মৃত্যুর আগে কিংবা পরে। তবে আল্লাহ অনুগ্রহ করে রক্ষা করলে ভিন্ন কথা। ইহকালে তাদের কর্মফল হচ্ছে, সন্তানের অবাধ্যতা এবং সদাচরণ না করা। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা দানে অবহেলার কারণে পরকালে আল্লাহর দরবারে এই বাবা জিজ্ঞাসিত হবে। তেমনি (তারবিয়া না দিয়ে) পাপাচারী সন্তান রেখে কোনো পিতা মারা গেলে মৃত্যুর পর সে কোনো উপকার পাবে না। কেননা, তারা তো নিজেরাই অপরাধ ও পাপ থেকে দূরে থাকবে না। নিজেরাই যেখানে লিপ্ত থাকবে পাপাচারে, সেখানে পিতা-মাতার জন্য দুআ করা তো বহু দূরের কথা। তাছাড়া আমলের গ্রহণযোগ্যতা এবং পিতার কবরে তার সওয়াব পৌঁছার জন্য শর্ত হলো, সন্তান নেককার হওয়া। হাদিসে উল্লেখ রয়েছে নেককার সন্তানের দুআ পিতা-মাতার কবরে পৌঁছে।

সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং পিতা-মাতার সাথে অবাধ্যতা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অসংখ্য হাদিস। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, ওই ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক, ওই ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক, ওই ব্যক্তির নাক ধূলোমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর রাসুল কার! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা- মাতা উভয়কে কিংবা তাদের একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেল, এরপরেও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।'

২. মুগিরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া, কারও প্রাপ্য না দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেওয়া। আর অপছন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, পিতা- মাতাকে গালি দেওয়া কবিরা গুনাহ। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর রাসুল! নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে কেউ? রাসুল বললেন, হ্যাঁ। দিতে পারে। (তার ধরণ হচ্ছে,) কেউ অন্যের পিতা কিংবা মাতাকে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তার পিতা বা মাতাকেও ওই লোক গালি দেয়। (এভাবেই নিজ পিতামাতাকে গালি দেওয়া হয়।)

৪. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগত সৃষ্টি সম্পন্ন করলেন। 'রিহম' (আত্মীয়তার বন্ধন) উঠে দাঁড়াল। আল্লাহ সেটিকে বললেন, (কী ব্যাপার উঠলে কেন?) থাম তুমি। 'আত্মীয়তার বন্ধন' বলল, আমাকে ছিন্নকারী থেকে আপনার কাছে এটা আশ্রয় চাওয়ার স্থান। (তাই আশ্রয় চাচ্ছি আপনার কাছে।) তখন আল্লাহ ঘোষণা করলেন, তুমি কি এতে রাজি নও যে, তোমার সঙ্গে যে সৎভাব রাখবে আমিও তার সঙ্গে সৎভাব রাখব। আর তোমাকে যে ছিন্ন করবে তাকে আমিও ছিন্ন করব। সে বলল, আমার রব! আমি এতে সন্তুষ্ট। আল্লাহ বললেন, তোমার জন্য আমি তাই নির্ধারণ করলাম।

৫. আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, "'রিহম' অর্থাৎ আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। সে বলে, আমার সাথে যার সম্পর্ক বজায় থাকবে আল্লাহ তাআলা তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমার সাথে আল্লাহও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন।"

জুবায়ের ইবনে মুতয়িম রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

উপরিউক্ত বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়, মা-বাবার অবাধ্য হওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।

আর উত্তম আখলোকের শিক্ষা যে সব সন্তানেরা পায়নি; তারাই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাসহ অন্যান্য হারাম কাজে লিপ্ত হয়। কেননা তাদের এসব কাজ থেকে বিরত রাখার কোনো নিয়ন্ত্রক নেই। অথচ এসব থেকে বাঁচতে হলে দরকার আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ। আল্লাহ বাঁচালেই তারা বাঁচতে পারবে।

"ছোটোবেলায় উত্তম তারবিয়া না পেলে বড়ো হয়ে সন্তান ভালো হয় না", এটা সামগ্রিক কোনো নীতি নয়। (ব্যতিক্রমও হতে পারে।) হ্যাঁ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হবে। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

দ্বিতীয় ক্ষতি : ত্রুটিপূর্ণ পৌরুষ ও ত্রুটিযুক্ত নারীত্ব

সত্যিকারের পৌরুষ এবং নারীত্ব সম্পর্কে ইতোপূর্বেই আমরা জেনে এসেছি। সেখানেই স্পষ্ট হয়েছে আমাদের কাছে উত্তম তারবিয়ার সুপ্রভাব। এখানে আমি উল্লেখ করব মন্দ তারবিয়ার কুপ্রভাব। সেই সঙ্গে বলব তার অশুভ পরিণতি। এই মন্দ তারবিয়ার কারণেই কিছু পুরুষ বেড়ে উঠে ত্রুটিপূর্ণ পৌরুষ নিয়ে। তেমনি কিছু মেয়ে বড়ো হয় অসম্পূর্ণ নারীত্ব নিয়ে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, তারবিয়াই হচ্ছে মুসলিম সমাজ গড়ে উঠার মূল ভিত্তি।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, প্রতিটি শিশু জন্ম নেয় ফিতরাতের (স্বভাব ধর্ম ইসলামের) ওপর। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি-খ্রিস্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।

এজন্যই আমরা দেখি, অধিকাংশ সময় পাপাচারে লিপ্ত পিতাদের ঔরস থেকে পাপাচারী সন্তানেরা জন্ম নেয়। এর কারণ হচ্ছে, সেই পিতারা না নিজেদের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয়, আর না সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে কোনো চিন্তা-ভাবনা করে। এই কারণে সন্তানগুলো বিগড়ে যায়। তাদের ছেলেরা অনুসরণ করে নারীর। আর মেয়েরা অনুসরণ করে পুরুষের। এর একমাত্র কারণ হলো, ইসলামি তারবিয়ার শূন্যতা। আর এ থেকেই তৈরি হয় ইমানি ত্রুটি।

ইতোপূর্বেই নারী-পুরুষ পরস্পরের সাদৃশ্য গ্রহণকারীদের ওপর লানত-সংক্রান্ত হাদিস উল্লেখ করেছি। এখানে উল্লেখ করছি আরেকটি হাদিস। সেটি হচ্ছে এই :

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত নবিজি বলেন, আমি দু-প্রকার জাহান্নামিকে আজো দেখিনি। এক প্রকার হলো ওই সব লোক, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মতো চাবুক তা দ্বারা লোকজনকে মারবে। আরেক প্রকার হচ্ছে সেই সব নারী, যারা কাপড় পরিহিত উলঙ্গ, অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্ট। তাদের মাথার খোঁপা হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো। ওরা জান্নাতে যেতে পারবে না। এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ এত এত দূর থেকেও জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।

এই হাদিসটি রাসুলের সত্যতার অন্যতম একটি নিদর্শন। হিজরতের চৌদ্দশ বছর পরে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর এই বক্তব্য। নবিজি থেকে প্রকাশিত অন্যতম একটি অলৌকিক ঘটনা এটি। আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত কিছু নারী ছাড়া বর্তমানে বস্ত্র থাকা সত্তেও বিবস্ত্র হয়ে গিয়েছে অধিকাংশ নারীই। নির্লজ্জ সে সব নারীদের পাতলা- আঁটোসাঁটো

পোশাক পরতে দেখা যায়। ফলে হাদিসে উল্লেখিত অবস্থার চেয়েও আরও বেশি জঘন্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়।

কিছু নারী-পুরুষকে বর্তমানে রাস্তায় দেখা যায়। তাদের অবস্থা হচ্ছে, পুরুষদের পোশাক থাকে অনেক লম্বা। ঝুলানো থাকে টাখনুর নিচু পর্যন্ত। এমনকি মাটি হেঁচড়ে যায়। পক্ষান্তরে নারীদের পোশাকগুলো থাকে গোছা কিংবা হাঁটু পর্যন্ত। উন্মুক্ত থাকে তাদের মাথা, ঘাড় ও বক্ষ। তারা নিজেদের বেগানা পুরুষদের সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে। মোটকথা ব্যাপারগুলো হয়ে গেছে সম্পূর্ণ উল্টো। আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন। এসবের পেছনে মন্দ তারবিয়ার মূল ভূমিকা রয়েছে; কুরআন-সুন্নাহর সাথে যার কোনো রকম সম্পর্ক নেই।

সন্তানদের সাথে পিতা-মাতার মন্দ আচরণ করা অনুচিত। এ প্রসঙ্গে তারবিয়া বিশেষজ্ঞরা সকলেই একমত। পিতা এবং মুরব্বি থেকে সন্তান যদি কঠোর ও রুঢ় ব্যবহার পায়। যখন তখন মারাত্মক প্রহার এবং তিরস্কারের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অবহেলা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, ভুল ধরা এবং দোষত্রুটি সব বলে বেড়ানো হয় মানুষের কাছে; এসব যদি সর্বদাই পিতা-মাতার থেকে সন্তানেরা পায়; তা হলে এসবের ছাপ তাদের আচরণ ও চরিত্রে পড়বে। ভয় ও সংকোচের স্বভাব তাদের কাজকর্মে পরিলক্ষিত হবে। পরিণতিতে সন্তানেরা হয় বেছে নেবে আত্মহত্যার পথ। কিংবা তারা পিতা-মাতার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। অথবা সর্বশেষ উপায় হিসেবে তারা উদ্বুদ্ধ হবে ঘর ত্যাগে। এসবই তারা করবে পিতা-মাতার যন্ত্রণাদায়ক আচরণ এবং অন্যায় কঠোরতার কারণে। এমন সন্তানকে সমাজে অপরাধী হতে এবং বিকৃত ও বিচ্ছিন্নতাবাদে লিপ্ত হতে দেখলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এরাই বেড়ে ওঠে বক্রতা, বোকামির ওপর। সেই সঙ্গে তারা হয় সামাজিক বন্ধন-মুক্ত।

তৃতীয় ক্ষতি : সন্তান নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়া

খারাপ তারবিয়া- যার ভিত্তি নববি আদর্শ নয়- তাতো ত্রুটিযুক্ত হবেই। আর এমন তারবিয়া প্রাপ্তরা তো নিকৃষ্ট চরিত্রেরই হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُون.َ

অর্থ : যারা মন্দ কার্যাবলিতে লিপ্ত তারা কি মনে করে, তারা জিতে যাবে আমার ওপর? তাদের অনুমান খুবই মন্দ!

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

بَل مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُلِدُون.َ

অর্থ : (আগুন তোমাদের কেন স্পর্শ করবে না,) অবশ্যই (করবে), যারা পাপকাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদের পরিবেষ্টন করে নিয়েছেন। তারাই দোজখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

আরেক আয়াতে এসেছে,

إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَأْتِكُمْ
وَنُدُ خِلْكُمْ مُّدُ خَلًا كَرِيمًا.

অর্থ :

: তোমরা নিষিদ্ধ কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে আমি ছোটো ছোটো গুনাহগুলো মাফ করে দেবো। তোমাদের মর্যাদাপূর্ণ এক স্থানে প্রবেশ করাব।

উকবা ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, তুমি যদি দেখ গুনাহ করা সত্ত্বেও কোনো বান্দাকে আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষিত বিষয় গুলো দান করছেন; তা হলে মনে করবে এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রদত্ত ছাড় ও সুযোগ প্রদান।

এরপর রাসুল এই আয়াত পড়েন,

حَتَّى إِذَا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنُهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُون.َ

অর্থ : তাদের দেওয়া উপদেশসমূহ তারা যখন বিস্মৃত হলো, তখন তাদের জন্যে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম সব কিছুর দ্বার। অবশেষে প্রাপ্ত নিয়ামত নিয়ে যখন তারা উল্লসিত হলো তখনই তাদের অকস্মাৎ পাকড়াও করলাম। ফলে তারা হয়ে পড়ে নিরাশ।

উপরিউক্ত মন্দ চরিত্রের নিন্দা-সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। যেসব সন্তানকে নববি প্রশংসনীয় স্বভাব-চরিত্র শিখানোই হয়নি; তারা সেসব সম্পর্কে জানবে কীভাবে!? তারা তো বড়ো হয়েছে পাপাচারি পিতা-মাতার কাছে; আল্লাহর প্রতি যাদের কোনোরূপ ভয় কিংবা ভ্রূক্ষেপ নেই। তো এমন বোকা-উদাসীনদের সন্তানেরা তো পাপাচারিই হবে। ভালো চরিত্রের ওপর মন্দ চরিত্রকেই প্রাধান্য দেবে। সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা বাদ দিয়ে মিথ্যাকে গ্রহণ করে নেবে। নিষ্ঠার পরিবর্তে বেছে নেবে কপটতাকে। দানশীলতা ও মধ্যমপন্থার ওপর প্রাধান্য দেবে অপচয় ও কৃপণতাকে। নম্রতা ও বিনয়ের জায়গায় তারা গ্রহণ করে নেবে অহংকার ও আত্মমুগ্ধতাকে। এছাড়াও সব ধরনের নিকৃষ্ট স্বভাবগুলোই বেছে নেবে। এটাই হচ্ছে, মন্দ তারবিয়ার অনিবার্য পরিণাম।

চতুর্থ ক্ষতি : শরিয়া-বিরোধী মুক্তমনা এক পরিবার গড়ে ওঠা

মন্দ তারবিয়ার অনিবার্য একটি পরিণাম হচ্ছে পরিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়া। পরিবারের সদস্যদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া। এর কারণ হলো, ইসলামি তারবিয়াই হচ্ছে চরিত্র গঠনের মৌলিক ভিত্তি। আর সেটাই এখানে অনুপস্থিত।

বয়ঃসন্ধিকালেই ছেলেমেয়েদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে মন্দ স্বভাবগুলো। আর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। পারিবারিক বন্ধন। পিতা-মাতা, সন্তানাদি, দাদা-দাদি, নাতি-নাতনি এবং তাদের নিজের জীবনযাপন ও কাজকর্ম নিয়ে। মহিলা চলে যায় তার কর্মক্ষেত্রে। বাচ্চাদের স্ত্রীসহ একটি যৌথ পরিবারের গুরুত্ব থাকে না। এমন পরিবারের স্বামী ব্যস্ত

থাকে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো। অপরদিকে সেই মা কাজ করে পুরুষদের পাশাপাশি বসে। লালনপালনের যথেষ্ট সময় থাকে না। ফলে মায়েদের জায়গা দখল করে নেয়। সেই পরিবারের মেয়ে চলে যায় তার বন্ধুর সাথে আনন্দ ভ্রমণে। ছেলে চলে যায় মন্দ সঙ্গীদের সঙ্গে ঘুরতে। এ-ই হচ্ছে একটি মুক্ত স্বাধীন পরিবারের প্রকৃত চিত্র। এরচেয়ে কিছুটা ভালো অবস্থা সেই সব পরিবারের তাদের কোনো আগ্রহ নেই ইসলামি তারবিয়া এবং ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে।

বহু মেয়েকে দেখা যায়, অবিবাহিতারূপে বাবার বাড়িতে বসে আছে। যুবকেরা আজকাল চলে গিয়েছে এমন অবস্থানে যা থেকে বোঝা যায় না, যুবতীদের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ, আকর্ষণ রয়েছে। কেননা তাদের যৌন চাহিদা পূরণের ব্যাপারটা সমাধান করে দিয়েছে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন-মুক্ত ব্যবস্থাপনা। আর এই সুযোগটা তৈরি হয়েছে কন্যার পিতাদের অধিক সম্পদের লোভের কারণে। যেন মেয়েরা একটি পণ্য। বিয়ে হচ্ছে ব্যবসা। ব্যবসায়ী তো পণ্য বেচার জন্য কৌশল অবলম্বন করবেই। ক্রেতাদের আগ্রহ ও প্রয়োজনকে কাজে লাগিয়ে চেষ্টা করবে পণ্যের সর্বোচ্চ দাম হাঁকাতে। কন্যার বিয়ের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই করে মেয়ের বাবারা। ছেলের ধার্মিকতা কিংবা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে জানতে চায় না। তাদের জানার আগ্রহ শুধু ছেলের সম্পদের ব্যাপারে। কতগুলো দোকান আর প্রপার্টি আছে ছেলের নামে, সেটাই মেয়ের বাবাদের মূল কৌতুহল।

এসবের কারণেই বর্তমানে নষ্ট হওয়ার পথে সুদৃঢ় পরিবার-ব্যবস্থা। এছাড়াও এর কারণে সৃষ্টি হয় এমন কিছু বিষয় যাতে খুশি হতে পারে না প্রকৃত কোনো মুসলমান। কিছুর পেছনে মূল দায়ী হচ্ছে, ইসলামি শরিয়াকে আঁকড়ে না ধরা। কুরআন- হাদিস সমর্থিত সঠিক তারবিয়া না থাকা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ، وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

অর্থ : রাসুল যা দেন তা আঁকড়ে ধরবে তোমরা। আর যা থেকে নিষেধ করেন তিনি তোমরা বেঁচে থাকবে সেটা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি বড়ো কঠিন।

ইরবাদ বিন সারিয়াহ রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, আমি তোমাদের রেখে যাচ্ছি আলোকিত দ্বীনের ওপর। তার রাত দিনের মতোই (উজ্জ্বল)।

পারিবারিক বন্ধন শিথিলতার কারণে সৃষ্টি হয় বহু খারাবি। তন্মধ্যে একটি হলো, মানুষের সাথে দম্ভ ও অহংকার প্রদর্শন।

ইয়াদ ইবনে হিমার রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ এ মর্মে ওহি পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হবে। একে অপরের ওপর সীমালঙ্ঘন, অন্যায় এবং গর্ব করবে না।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, কেউ যদি বলে 'মানুষ সব বরবাদ হয়ে গেছে"। তা হলে সে নিজেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত।

আবু খিরাশ সুলামি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলতে শুনেছেন, নিজ ভাইয়ের সাথে কেউ এক বছর সম্পর্ক ছিন্ন রাখলে সে যেন তাকে হত্যাই করল।

পঞ্চম ক্ষতি : সন্তানদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হওয়া

মন্দ তারবিয়ার একটি ক্ষতি হলো সন্তানদের মাঝে শত্রুতা এবং ঘৃণা তৈরি হওয়া। এর কারণ হচ্ছে, তাদের মাঝে কোনোরূপ হৃদ্যতা, আন্তরিকতা এবং বোঝাপড়া থাকে

না। ভাই ভালোবাসে না আপন ভাইকে। এসব হয়েছে তার পিতা কিংবা মুরুব্বি থেকে প্রাপ্ত মন্দ তারবিয়ার কারণে। আল্লাহ তাআলা রেষারেষি এবং শত্রুতা করতে নিষেধ করেছেন। হোক সেটা আপন ভাই কিংবা সাধারণ মুসলিমদের সাথে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ.

অর্থ : মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং নিজেদের ভাইয়ের মাঝে তোমরা সমঝোতা করে দাও।

মুমিনদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكُفِرِينَ

অর্থ : তারা মুমিনদের ব্যাপারে কোমল এবং কাফেরদের ক্ষেত্রে কঠোর।

আরেক জায়গায় ইরশাদ হয়েছে,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থ : মুহাম্মাদ আল্লাহ তাআলার রাসুল। আর তাঁর সঙ্গীরা কাফেরদের ওপর অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু নিজেরা পরস্প সহানুভূতিশীল।

আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেন, তোমরা পরস্পরে কোনো বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব রেখো না। হিংসা এবং একে অন্যের বিরুদ্ধাচরণ করো না; বরং আল্লাহর বান্দা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য তিন দিনের অধিক তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করে থাকা বৈধ নয়।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি বলেছেন, প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়। এমন প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়; যে কাউকে আল্লাহর সাথে শরিক করে না। তবে ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না যার (মুমিন) ভাই

ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হয়, এ দু-জনকে অবকাশ দাও যেন তারা আপস-মীমাংসা করে নেয়।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও সোমবার (আল্লাহর সামনে) বান্দার আমল পেশ করা হয়। এরপরের কথাটুকু উপরিউক্ত হাদিসের মতোই। উপরিউক্ত বিশুদ্ধ হাদিসগুলো থেকেই আমরা বুঝতে পারি তিন দিনের বেশি সম্পর্কচ্ছেদ করে রাখা হারাম। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলে তাতে কোনো পাপ হবে না। কারণ, এই সম্পর্কচ্ছেদের উদ্দেশ্য হলো, যেন ওই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাওবা করে ফিরে আসে। যেই সন্তাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা, সখ্যতা ও ভালোবাসার শিক্ষা না দেওয়া হবে তাদের মধ্যেই সৃষ্টি হবে সম্পর্কচ্ছেদ এবং কথা বন্ধ করার মতো নিকৃষ্ট স্বভাব-চরিত্র। তবে আল্লাহ যার ওপর রহম করবেন তার কথা ভিন্ন। কবি বলেন, আমাদের সন্তানেরা তাতেই গড়ে উঠবে, যাতে তাদের বাবারা অভ্যস্ত করে তুলবে।

পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তানদের বোঝানো এবং পথ দেখানো। হিদায়াত দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তিনি যাকে ইচ্ছা পথ দেখান আর যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন।

সন্তান বিগড়ে যাওয়ার অনেক কারণ হতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ তুলে ধরা হলো

১. দারিদ্র্য। ২. বাবা মায়ের তালাক। ৩. এমন অখণ্ড অবসর যা সন্তানের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ৪. মন্দ বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গী। ৫. সন্তানের সাথে পিতা-মাতার মন্দ ব্যবহার। ৬. অপরাধ মূলক এবং অশ্লীল নাটক-সিনেমা দেখা। ৭. সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা না দেওয়া। ৮. ইয়াতিম হওয়া।

উপরিউক্ত কোনো একটি কারণ থাকলে সন্তান সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তবে আল্লাহ যাকে হিফাজত করে সে ব্যতিক্রম।

মুসলিম চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার কর্তব্য

“হে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক একটি বড়ো জুলুম। হে আমার পুত্র! সালাত কায়েম করো, ভালো

,

কাজের আদেশ করো, মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করো এবং বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয়ই এটি মজবুত সংকল্পের কাজ। দম্ভ করে মানুষদের অবজ্ঞা করবে না, জমিনে ঔদ্ধত্যের সাথে চলাফেরা করবে না। কারণ, আল্লাহ দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না। চলাফেরায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর রাখবে সংযত। নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট আওয়াজ হলো গাধার ধ্বনি।–সূরা লোকমান : ১৩, ১৭-১৯

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা কেবল কুরআন-হাদিস, ফিকহ ও শরিয়াহর গভীর জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জাগতিক সকল ধরনের জ্ঞান অর্জনই ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত। আল্লাহর ইবাদত, মানুষের সেবা, সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা এবং নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যক্তিগত অর্জন ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এর ফলে আর্থিক উন্নতি ও মানসিক প্রশান্তি দুটোই অর্জিত হয় । মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মাঝে এই ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছে যে, নিম্নোক্ত বিষয়ের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করে দেওয়াই ইসলামি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত অধিকার (হুকুকুল্লাহ)।
মানুষের সাথে সম্পর্কিত অধিকার (হুকুকুল ইবাদ)।

নিজের পরিবার, একান্নবর্তী পরিবার, সমাজ, মেহমান, ভ্রমণকারী, গরিব, মিসকিন, বিধবা, সহকর্মী, মুসলিম, অমুসলিম সকলের সাথে আমাদের আচার- আচরণ, দায়িত্ববোধ ও লেনদেন হুকুকুল ইবাদ-এর অন্তর্ভুক্ত।

• অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত অধিকার। যেমন : পশু-পাখি ও পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত অধিকারসমূহ।

• বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক জানা এবং পৃথিবীর সম্পদসমূহের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও শারীরিক নিয়মাবলি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া ।

• আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিশীল প্রজ্ঞার প্রশংসা জ্ঞাপন এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে গভীর অধ্যয়ন।

পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের সন্তানদের এই সমস্ত বিষয়ে কীভাবে অভ্যস্ত করতে পারি, তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

এটা পরিষ্কার, সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি স্কুলের ওপর নির্ভর করি না। সুতরাং তারা যে সময় স্কুলে থাকে না, আমাদের উচিত সে সময় তাদের শিক্ষার বাকি অংশ পূর্ণ করা।

মুসলিম চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে পিতা-মাতা ও সন্তানের জন্য প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কার্যকর প্রশিক্ষণের জন্য চমৎকার মানবীয় যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ প্রশিক্ষক প্রয়োজন, যিনি আস্থা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করতে পারেন। এজন্যই বলা হয়ে থাকে- একটি শিশুকে গড়ে তোলার জন্য বিশাল একটি গ্রামের প্রয়োজন। যে শিশু অনুকরণীয় মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়, সে যেকোনো জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, যেকোনো স্থানে পৌঁছতে পারে। কারণ, সে তাদের থেকে সকল ধরনের নির্দেশনা পেয়ে থাকে।

প্রথম পদক্ষেপে পিতা-মাতা হিসেবে আমাদের জানতে হবে, কী কী অবলম্বন আমাদের রয়েছে। সন্তানদের পেছনে আমরা কতটুকু সময় দিতে পারব। তাদের যথাযথ উপায়ে গড়ে তোলার জন্য কতটুকু জ্ঞান রাখি ইত্যাদি। সন্তানদের প্রতিপালনের জন্য বাইরের

অনেক কিছুই প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ- পরিবার, সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় মসজিদ, ছুটির সময় ইত্যাদি।

সাধারণত, পিতা-মাতাই সন্তানদের প্রথম শিক্ষক, রোলমডেল ও প্রশিক্ষক। সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতা বিশেষ করে মায়েদের বিশেষ এক আকর্ষণ রয়েছে। এই আকর্ষণ পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না। জন্মের পর থেকেই সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার এই ধরনের আকর্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত, এর ওপরই একটি সফল মুসলিম প্রজন্মের বেড়ে উঠা নির্ভর করে। ভালোবাসা ও দয়া এমন বিষয়, যার মাধ্যমে ভয় ও রূঢ়তাকে কাটিয়ে সন্তানদের সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে শিক্ষা প্রদান করা যায়।

নিচে কিছু পরীক্ষিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তুলে ধরা হলো, যা মুসলিম চরিত্র গঠনে নিজ ঘরে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উপদেশ, শাসন ও সতর্কীকরণ : পৃথিবীর বুকে যত নবি-রাসূল ও প্রজ্ঞাবান মানুষ আগমন করেছেন, তাঁদের সবাই নিজ সম্প্রদায়ের প্রশিক্ষণের জন্য এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। পবিত্র কুরআনে পুত্রকে উদ্দেশ্য করে লোকমান-এর চমৎকার উপদেশ বর্ণিত রয়েছে।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য উপযুক্ত সময়ে যথাযথ ও সংগত উপায়ে সন্তানদের উপদেশ দিতে হবে। রাসূল মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক বিষয়ে এমনভাবে উপদেশ দিতেন, যাতে তাদের অন্তরে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে। উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি কখনো কঠোরতা অবলম্বন করতেন না।

উপমা দেওয়া এবং গল্প বলা : মানুষদের শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআনে পূর্বের জাতিসমূহের ঘটনা অত্যন্ত সুন্দর উপায়ে বর্ণিত হয়েছে, যাতে মানুষ সতর্ক এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। একটি ‘উত্তম কথা একটি উত্তম গাছের ন্যায়’, অপরপক্ষে ‘খারাপ বা মন্দ কথা একটি ক্ষতিকর বৃক্ষের ন্যায়।' এই উপমাটি পবিত্র কুরআনে খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত রয়েছে। ঈসা ও মুহাম্মাদ * সাথিদের নিকট কিছু বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উত্তম উপমা প্রদান করতেন। রাসূল মানুষের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহারে সক্ষমতাকে বৃষ্টির পর মাটির প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন। মানুষের অন্তরে উপমা ও গল্পের বিরাট প্রভাব রয়েছে। এগুলো মানুষকে জীবনের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সাহায্য করে। পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের সামনে বাস্তব ঘটনার বর্ণনা ও উপমা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করা।

অনুকরণীয় আদর্শ :

রাসূল মানবজাতির নিকট অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন (সূরা আহজাব : ২১)।

তিনি অনেক কাজে সাহাবিদের সাথে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন। যেমন : মসজিদে নববি নির্মাণ এবং খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননসহ আরও অনেক কাজে তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সর্বোত্তম পিতা, সঙ্গী ও সহযোদ্ধার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। শিশুদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণে রোলমডেলের বিশাল ভূমিকা রয়েছে । পিতা-মাতাকে সন্তানদের জন্য যোগ্য রোলমডেল হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে।

পুরস্কার ও শাসন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ও সৎ কর্মশীল ব্যক্তিদের পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে জাহান্নাম সৃষ্টি করছেন, তাঁর প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারী এবং অসৎ কর্মশীলদের শাস্তির জন্য। রাসূল * সাহাবিদের

উত্তম কাজের জন্য প্রশংসা এবং তাঁদের অগ্রহণযোগ্য আচরণের জন্য মাঝেমধ্যে শাসন করতেন। এই ক্ষেত্রে তিনজন সাহাবির তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শনের শাস্তি উল্লেখযোগ্য। শিশুদের জীবনের বাস্তবতা বোঝানোর ক্ষেত্রে পুরস্কার ও শাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তানদের ভালোবাসার মাধ্যমে একমাত্র যৌক্তিক কারণেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি তাদের এটাও জানিয়ে রাখতে হবে, অগ্রহণযোগ্য আচরণের জন্যই তাদের শাসন করা হচ্ছে। তাদের প্রতি পিতা-মাতার নিঃশর্ত ভালোবাসার কথাও তাদের অন্তরে উপলব্ধি করাতে হবে।

প্রতিদিনের রুটিনে নিম্নোক্ত কাজগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে—

• প্রাত্যহিক কাজে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল প্রদর্শিত বিধানের অনুসরণ করুন, যাতে সন্তানরাও এর সাথে পরিচিত হতে পারে। এর মধ্যে ইসলামের মৌলিক বিধিবিধান, আল্লাহর স্মরণ, বিভিন্ন সময়ে রাসূল * কর্তৃক নির্দেশিত দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা অন্তর্ভুক্ত।

• যথাসময়ে সালাত আদায় করুন। এই ক্ষেত্রে নামাজের নির্দিষ্ট সময়ে মোবাইলে আজানের টিউনকে অ্যালার্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা দিনে পাঁচবার সালাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। মসজিদ যদি বাসার কাছেই অবস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে- নিজ সন্তানকে প্রতিনিয়ত জামাতের সাথে সালাত আদায় করতে নিয়ে যাওয়া।

প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন, যা মুসলমানদের জীবনবিধানের মূল উৎস। প্রত্যেক ঘরে কুরআনের একাধিক কপি ও প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ থাকা উচিত। এই সকল গ্রন্থসমূহ দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

• নিজ ঘরে প্রত্যেক দিন কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম জারি রাখুন, যাতে শিশুরা এই অভ্যাসটি অর্জন করতে পারে। সিডি কিংবা মোবাইলে কুরআন তিলাওয়াত রাখতে

পারেন। অবসর সময় কিংবা গাড়িতে কাটানো সময়গুলো কুরআন শ্রবণের মাধ্যমে কাজে লাগানো যেতে পারে।

• আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা করতে সন্তানদের উৎসাহিত করুন। তাদের বোঝান, আমাদের পুরো অস্তিত্ব এবং চারিদিকের মনোরম সৃষ্টি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। প্রকৃতিতে ঋতুর পরিবর্তন, প্রস্ফুটিত ফুলসহ আল্লাহর সকল সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর মহিমা তুলে ধরুন ।

• প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করুন, যাতে সন্তানরা তাদের উপযুক্ত বন্ধু সহজেই বাছাই করতে পারে ।

• নিকটাত্মীয়দের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন। এটি শিশুদের মাঝে সমাজবদ্ধ হওয়ার দক্ষতা এবং অন্যদের সাহায্য করার আগ্রহ তৈরি করে। মানবসেবায় এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নবিদের সুন্নাহ, যা এক অনন্য সমাজ গঠনের অপরিহার্য উপাদান।

• নিয়মিত পারিবারিক বৈঠকের আয়োজন করুন। এটি পরিবারের বন্ধনকে আরও দৃঢ় এবং ইসলামি হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বৃদ্ধি করে। রাসূল ও সন্তানদের সঙ্গে পারিবারিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। অভিভাবকরা পরিবারের বিভিন্ন বিষয়ে সন্তানদের থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। এতে তারা পারিবারিক বিষয়ে আরও আগ্রহী হয়।

• সহোদরদের মাঝে কুইজ সন্ধ্যা, মুখস্থকরণ প্রতিযোগিতার মতো বিভিন্ন জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। ইসলাম জ্ঞান ও তাকওয়াভিত্তিক প্রতিযোগিতার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতা তরুণদের নেতৃত্বগুণের বিকাশ ঘটায়। সন্তানরা সমাজের অন্যান্য মানুষদেরও ভালোবাসতে শেখে।

এই পরিবেশের প্রভাব মুসলিমদের আচার-আচরণের ওপর প্রতিফলিত উচিত, যা ইসলামি সামাজিক জীবনের সারবস্তু।

অন্যদিকে যে সকল সন্তান বেখায়ালি ও রূঢ় স্বভাবের পিতা-মাতার কাছে বেছে উঠে কিংবা যারা অসুস্থ পরিবেশে গড়ে উঠে, তাদের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রতি আগ্রহ তেমন জন্মায় না; বরং তারা হয় সমাজের বোঝা। অভাব শু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হয় না; তা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও হতে পারে। আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা সমাজে অশান্তির সৃষ্টি করে। অন্যদিকে নৈতিক আধ্যাত্মিক বঞ্চনা তরুণদের মাঝে সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং মনুষ্যত্বের পতন ঘটায়। এই পরিস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি সাধন হতে পারে না।

এমন একধরনের পরিবার গঠন করতে হবে যেখানে প্যারেন্টিং হবে ঈমানের ক্ষেত্রে আপসহীন, পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ ও পরিশ্রমী। এর জন্য প্রয়োজন উত্তম কৌশল, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, নিয়মিত সতর্কতা, উদ্যোগ ও দৃঢ় সংকল্প । মায়ের গর্ভে আসার পর থেকেই সন্তান প্রতপালনের দায়িত্ব শুরু হয়। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। এই দায়িত্ব জীবনব্যাপী পালন করতে হয়। সন্তান প্রতিপালনের মধ্যে রয়েছে জন্মের পর থেকেই শিশুদের শারীরিক পুষ্টি নিশ্চিত করা, মানসিক সমর্থন দেওয়া, সামাজিকভাবে গড়ে তোলা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রচেষ্টা চালানো। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতা-মাতার জন্য একই সাথে চ্যালেঞ্জিং, দুঃসাহসিক, আনন্দদায়ক ও সুখকর। এর প্রতিদানও বিশাল। তা হলো—দুনিয়ায় সফল হওয়ার তৃপ্তি এবং আখিরাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন।

সন্তানের ওপর কর্তৃত্ববান হওয়ার অধিকার পিতা-মাতার রয়েছে। তবে সচেতনতার সঙ্গে এবং কার্যকর উপায়ে এই অধিকারকে প্রয়োগ করতে হবে। নিচে সন্তানদের

সার্বিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই সমস্ত অধিকার প্রয়োগের কিছু পন্থা উল্লেখ করা হলো-

পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে-

• সন্তানদের শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত শুরু করুন। ইসলাম ও বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা দিন। এক্ষেত্রে খুব বেশি দেরি করা যাবে না। সন্তানদের ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও বিভিন্ন যুগের মহান মুসলিম ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে, যাতে তারা এদের মধ্য থেকে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব খুঁজে নিতে পারে। শিশুমনে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত সত্য কাহিনিসমূহের বিরাট প্রভাব রয়েছে। তাদের এগুলো শোনান। এসব ভিত্তির ওপর তাদের চরিত্র একবার গঠিত হয়ে গেলে ইসলামি আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

• ইসলামের সঠিক চেতনা ধারণ করে, তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করার জন্য সন্তানদের উৎসাহিত করুন। রাসূল -এর নির্দেশনা অনুযায়ী, সাত বছর থেকেই সন্তানদের সালাতের শিক্ষা দিন। দশ বছর থেকে সালাত ত্যাগ করলে শাসন করুন।

• কার্যকর উপায়ে গাইড করার উদ্দেশ্যে তাদের মনমানসিকতা বুঝুন। এই ক্ষেত্রে তাদের আচার-আচরণের প্রতি স্বাভাবিক পর্যবেক্ষণ করা এবং নিজের বিচার-বুদ্ধি খাটানো জরুরি।

• তাদের শালীন ও অর্থবহ বিনোদনের সুযোগ দিন। বাচ্চারা আনন্দ উপভোগ পছন্দ করে। পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে তাদের সুস্থ বিনোদনের উপায় দেখিয়ে দেওয়া; অন্যথায় তারা অনেক বিরক্তি অনুভব করবে কিংবা নিজদের মতো করে বিনোদনের উপায় খুঁজে নেবে। রাসূল শিশুদের সাথে তাদের মতো করে আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

• সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নিজেদের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করুন, যাতে সন্তানরা বাউন্ডারি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। যে সকল পিতা-মাতা সন্তানদের শৃঙ্খলা দিতে জানেন না, তাদের সন্তানরা জীবনযাপন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পায় না।

তাদের মানসিকতার দিকে খেয়াল রাখুন। কথাবার্তা ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সংগত আচরণ করুন, যাতে তারা অস্বস্তি বোধ না করে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল নিয়মকানুন ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন কার্যকলাপ সন্তানদের সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। বুদ্ধিমান সন্তানরা পিতা-মাতার আচার-আচরণের সংগতি পর্বেক্ষণ করেন। সংগতিপূর্ণ আচরণ মানেই কাঠিন্য নয়। যদি কোনো নিয়মকানুন পরিবর্তন করা হয়, তাহলে সন্তানদের কাছে এর যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

সন্তানদের সাথে নির্দেশমূলক আচরণ থেকে বিরত থাকুন। সন্তানদের দিয়ে কোনো কিছু করাতে চাইলে আমাদের উচিত তাদের মধ্যে কর্মোদ্দীপনা তৈরি করা। এই ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে তাদের সামনে যথাযথ কারণ উল্লেখ করতে হবে। পিতা-মাতার উচিত তাদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা, যাতে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কাজ করে।

• সন্তানদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখুন। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ নতুন উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অপরিহার্য। তবে অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ তাদের বিধায় তাদের জন্য অভিজ্ঞদের পথনির্দেশ প্রয়োজন। তাদেরই কল্যাণার্দে
সুস্থ উপায়ে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

• যতই কঠিনই হোক না কেন, নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। প্রতিশ্রুতি সন্তানদের অনেক কষ্ট দেয়। তারা একে মিথ্যা হিসেবেও বিবেচনা করতে পারে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আস্থার ঘাটতি তৈরি করে।

• শিশুদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। অতিরিক্ত স্বাধীনতা তাদের পদচ্যুত করতে পারে, আবার অতিরিক্ত কড়াকড়িও তাদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারে। ইসলাম মানেই পরিমিতিবোধ এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বন। শিশুরা যেন চরমপন্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে না উঠে, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

• কাজকর্মে দৃঢ়তা অবলম্বন করুন। ক্ষতিকর না হলে কোনো জিনিস তাদের কাছে গোপন করবেন না। কারণ, সন্তানদের কাছে গোপন করার চেষ্টা বিপর্যয় আনতে পারে। এতে সন্তানরা ধীরে ধীরে তাদের পিতা-মাতার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে।

• সহজ ও স্পষ্ট ভঙ্গিতে সন্তানদের সাথে কথা বলুন, যাতে তারা আপনার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। সরল ও সাধারণ ভাষা সন্তানদের ইতিবাচক উপায়ে চলাফেরা করতে উৎসাহিত করে।

• সন্তানরা যখন কথা বলে, তখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন। অযথা হস্তক্ষেপ করবেন না। তাদের কথায় হস্তক্ষেপ করলে তারাও বড়োদের কথায় হস্তক্ষেপ করার জন্য উৎসাহিত হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবারের সকলকে নিয়ে একসঙ্গে আলোচনা করুন। পারিবারিক আলোচনায় সবাইকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে সন্তানরা পরিবারের বিষয়ে আগ্রহী হয় এবং নিজেদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে বিশ্বাস করে।

• সন্তানের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করুন। সন্তানদের জানান, পিতা-মাতাসহ কেউ-ই একদম পারফেক্ট না। পিতা-মাতা যখন সন্তানদের ভুলভ্রান্তিগুলো ক্ষমা করেন, তখন অভিভাবকদের বিচার-বিবেচনা সম্পর্কে তাদের মনে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। তারা কখনোই পিতা-মাতাকে অবিবেচক ভাবতে পারে না।

সন্তানদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। সন্তানদের জীবনেও ভালো ও খারাপ সময় আসে। সুতরাং তাদের সুযোগ দিন। বড়োদের জীবনে যেমন ভালো ও খারাপ সময় থাকে, তেমনি সন্তানদের জীবনের উত্থান-পতনের বিষয়টিকেও বিবেচনা করতে হবে।

• বিভিন্ন পারিবারিক কার্যক্রমে সন্তানদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিন। বেগ পেতে হবে না—এমন সহজ কাজগুলো তাদের করতে দিন। এর মাধ্যমে তারা পরিবারকে নিজের করে নিতে শিখবে। এটি তাদের আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি করবে।

• সকল সন্তানের সাথে সমান আচরণ করুন। (আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসায়ি)। এক সন্তানের প্রতি অধিক আদর-যত্ন, অন্য সন্তানের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন নিঃসন্দেহে নিষ্ঠুর অভ্যাস। এই ধরনের আচরণ সহোদরদের মাঝে হিংসা- বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করে।

• বন্ধু-বান্ধব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সন্তানদের ইতিবাচকভাবে সহযোগিতা করুন। এই ক্ষেত্রে তাদের আচার-আচরণ, উত্তম ইসলামিক ও মানবিক চরিত্রের দিকে লক্ষ রাখুন।

• পরিবারের সদস্য কিংবা বৃহৎ সমাজ থেকে অনুকরণীয় আদর্শিক ব্যক্তিত্ব বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করুন।

• সংবেদনশীল বিষয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন। সন্তানরা যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষের দিকে চলে আসে, তখন পিতা-মাতার কর্তব্য হচ্ছে—সংবেদনশীল বিষয়ে পুত্র ও কন্যার দিকে আলাদাভাবে নজর দেওয়া। বিশেষ করে যৌন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যার প্রতি পিতা-মাতার আলাদা আলাদা দায়িত্ব রয়েছে।

• সন্তানদের শিক্ষা দেওয়া ও শাসন করার উপায় সম্পর্কে দুজন একসঙ্গে আলোচনা করুন এবং সন্তানদের সঙ্গে একই সুরে কথা বলুন। শিশুদের অন্তরে যেন এই ধরনের অনুভূতি তৈরি না হয়, পিতা-মাতা একজন অন্যজনের চেয়ে কঠোর কিংবা নরম দিলের অধিকারী। সন্তানরা এর সুযোগও নিতে পারে। কোনো বিষয়ে দুজনের মাঝে মতানৈক্য তৈরি হলে তা সন্তানদের সামনে আলোচনা না করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করুন।

• ভালো কাজের জন্য সন্তানদের পুরস্কৃত করুন। এটি তাদের মধ্যে আত্মপ্রশান্তি জোগায় এবং প্রতিনিয়ত সৎ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে। এটি তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরি করে যে, পরিবারে তাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

• সন্তান কোনো অপ্রত্যাশিত কাজ করে ফেললে যতদূর সম্ভব গায়ে হাত না রাখুন। এই প্রক্রিয়ায় পিতা-মাতা উভয়কেই জড়িত থাকতে হবে। যে সম ভুলেই বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে তাদের শাসন করুন। এক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠতা বজায় পিতা-মাতা শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন, তারা জানেন—কখন, কীভাবে এই দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়। সন্তানরা যদি খু খারাপ অপরাধ করে ফেলে, তাহলে তাদের শাসন করার প্রক্রিয়া হলো-

ক. প্রথমে বোঝান, তার কর্মে আপনি নাখোশ

খ. তাকে সতর্ক করুন

গ. সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিন।

• সন্তানদের ক্ষমা চাইতে শেখান এবং তারা ক্ষমা চাইলে তা গ্রহণ করুন। এটি তাদের বিবেক বৃদ্ধি করে। সন্তান ক্ষমা চাইলে পিতা-মাতার উচিত বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে ক্ষমা করে দেওয়া। সন্তানদের আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারেও শিক্ষা দিতে হবে। অন্যদিকে, পিতা-মাতারও উচিত কোনো ভুল করলে সন্তানদের কাছে ক্ষমা চাওয়া। এক্ষেত্রে অযথা অহমিকা ধরে রাখা উচিত না।

• সন্তানের শিক্ষকদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন। এর ফলে সহজেই জানতে পারবেন, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিকভাবে আপনার সন্তানের কী ধরনের অগ্রগতি হচ্ছে। যে বাচ্চাদের অভিভাবক শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত কথা বলেন, স্কুলে তাদের প্রতি বেশি যত্ন নেওয়া হয়।

সর্বোপরি আপনার সন্তানের সঙ্গ উপভোগ করুন। কারণ, সন্তানের মতো করে কেউ আপনাকে ভালোবাসবে না কিংবা যত্নও নিতে পারবে না। পিতা-মাতা হওয়া সত্যিই বিশাল এক নিয়ামত ও সুযোগ। সুতরাং অভিভাবকত্বের এই
মূল্যবান সময়টা উপভোগ করুন।

সন্তান বিপথগামী হলে করণীয়

এমন অনেক দ্বীনদার মা-বাবা রয়েছেন যাদের সন্তান বিপথগামী হয়েছে, অনেকে আবার নাস্তিকতার পথ বেছে নিয়েছে। পরিণতিতে তারা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছেন। আবার এমন অনেক বাবা আছেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে দাঈ, বেশ সফলতার সাথে মানুষদের দ্বীনের পথে ডাকেন, সমাজে যাদের ব্যক্তিত্ব ও বেশ প্রভাবও রয়েছে।

“এই আজ সেসব মানুষ সম্পর্কে কথা বলতে যাব না, যাদের ইখলাসের ঘাটতি রয়েছে, যারা মানুষকে দাওয়াত দিয়ে জনপ্রিয় হতে চায়, সমাজ সংশোধন করতে গিয়ে নিজ পরিবারকে যারা আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়, সন্তান বিপথগামী হলে যারা ভাবে, কথা যেন কেউ জানতে না পারে। না হয় আমার সুনাম মাটিতে মিশে যাবে।' আজ আমাদের আলোচনা এই শ্রেণির মানুষদের সম্পর্কে নয়। বরং আমরা কথা বলব সেসব একনিষ্ঠ দাঈ সম্পর্কে যারা সন্তানদের ব্যাপারে যত্নশীল। তাদের বিপথগামী হতে দেখলে যারা অপরাধবোধ থেকে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলেন, ‘নিশ্চিতভাবে আমি তাদের দীক্ষায় ত্রুটি করেছি। যেখানে আমার সন্তানরাই বিপথগামী সেখানে অন্য মানুষদের আমি কীভাবে দাওয়াত দিই! আমি দুমুখো নীতি অবলম্বন করতে পারি না। এখন আমার মূল দায়িত্ব হলো, নিজ সন্তানকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা।’

এই শ্রেণির বাবা-মা যখন কোনো ভালো কাজের আদেশ দিতে যান কিংবা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে যান তখন তারা নিজেদের মুনাফিক বা প্রতারক মনে করতে থাকেন। তারা সন্তানদের মাঝে পরিবর্তন আনতে চান কিন্তু অধিকাংশ সময় ব্যর্থ হন। এভাবে দিনে দিনে ব্যর্থতাবোধ ও হতাশা এসে তাদের গ্রাস করে ফেলে।

আমরা এই শ্রেণির বাবা-মাদের উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, আমরা মনে করি আপনাদের এই অনুভূতি আপনাদের ভেতরে থাকা কল্যাণ ও মঙ্গলের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু প্রিয়

ভাইয়েরা, ইখলাস, সততা, অপরাধবোধ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে শয়তান আপনাদের টলিয়ে দিতে চায়। হতে পারে আপনার সন্তান তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের কপালে আল্লাহ হিদায়াত রাখেননি। হ্যাঁ যখন সে বিপথগামী হবে তখন অবশ্যই আপনার দায়িত্ব, তার এই করুণ পরিস্থিতির পেছনের কারণ তালাশ করা, কোন কারণে সে এই পথ বেছে নিল তার অনুসন্ধান করা। এরপর তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো। বিশেষ করে আগের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে অন্যান্য সন্তানদের আদর্শ পদ্ধতিতে গড়ে তোলা।

দ্বীনদার ও দাঈ ব্যক্তিদের সন্তান বিগড়ে যাওয়ার বিভিন্ন কারণ হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো—সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা দেওয়া হলেও পাশাপাশি তাদের মনের আকুতি মনোযোগ দিয়ে না শোনা, কড়াকড়ি করা, হিংস্রতা দেখানো, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া, বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা, অনেক সময় হতে পারে দাওয়াতের পথে বাবা বেশ কষ্টসাধ্য পথ পাড়ি দিয়েছেন কিন্তু সন্তান এই পথের কষ্ট দেখে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছে, শয়তান বা নফসের প্ররোচনায় পড়েছে ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ হতে পারে। মোদ্দাকথা আপনার দায়িত্ব হলো, পূর্বের ভুল চিহ্নিত করে যথাসম্ভব অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো আর বিগড়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরিয়ে আনাকে নিজের সবচেয়ে অগ্রগণ্য মিশনে পরিণত করা।

কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, নিজেকে মুনাফিক ভেবে দ্বিমুখীতার দোহাই দিয়ে দাওয়াতের এই মহান কাজ থেকে বিরত থাকা মোটেও উচিত হবে না। ভেবে দেখুন, এক লোকের কথায় সমাজের বহু মানুষ হিদায়াতের দিশা পেত, একসময় শয়তান তার সন্তানকে কুপথগামী করল আর এই কারণে লোকটি দাওয়াত দেওয়াই বন্ধ করে দিলো। তার এমন কর্মকাণ্ডে শয়তান কতটা সফলতার হাসি হাসবে ভাবতে পারছেন? এমনকি আপনার এই হতাশা বিপথগামী সন্তানের সাথে উপযুক্ত আচরণ করা এবং তার ওপর

প্রভাব সৃষ্টির সক্ষমতাটুকুও কেড়ে নেবে। প্রিয় ভাই, আপনার সন্তান বিপথগামী হওয়ার পরও দাওয়াতের এই পথে অবিচল।

َإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

"আপনি যাকে পছন্দ করেন ইচ্ছে করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না।"

আয়াতটি আপনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু যখন বিষয়টি আপনার সাথেই ঘটল তখন আপনি আর নিতে পারলেন না, ভাবতে পারলেন না যে, আপনার সন্তানও জাহান্নামের অধিবাসী হতে পারে। হ্যাঁ, মেনে নেওয়া বেশ কষ্টকর বটে তবে নিজেকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে দাওয়াত চালিয়ে যান আর রবের দরবারে সন্তানের হিদায়াতের দুআ করতে থাকুন। সেই সাথে এই বাস্তবতাটুকুও মেনে নিন যে, আপনার সন্তানকে হিদায়াতের পথ দেখানোর ক্ষমতা আপনার হাতে নেই।

'সন্তানকে ইসলামে ফিরে আনাই হলো আমার জীবনের মূল লক্ষ্য' এই বাক্যটি আমি কখনো সঠিক মনে করি না। কারণ আপনি জীবনের সফলতা এমন এক বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন যার ক্ষমতা আপনার হাতে নেই। হতে পারে সৃষ্টির হাজারো বছর পূর্বে আল্লাহ এর উলটোটি নির্ধারণ করে রেখেছেন। সন্তানকে ইসলামে ফিরিয়ে আনা নয়; বরং আপনার জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত তাকে দাওয়াত দেওয়া। তখন তার প্রতি জমে থাকা আপনার মায়া ও মর্মবেদনা মিশ্রিত দাওয়াত তাকে আকৃষ্ট করবেই। তবুও যদি সে সৎপথ গ্রহণ না করে তখন ব্যর্থতার দায়ে ভেঙে পড়বেন না। মানুষদের দাওয়াত দেওয়ার পথে অবিচল থাকুন, সমাজ সংস্কারে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। স্মরণে রাখুন, নূহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবি হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তার সন্তানকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত করা।

সন্তানদের ধৈর্য ও দৃঢ়তা শিক্ষা দিন

মিশরে ইসলামপন্থীদের পতনের পর স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষ থেকে তাদের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়গ। রাবেয়ার প্রান্তরে একদিনেই খুন করা হয় দুই হাজারেরও অধিক ধর্মপ্রাণ আন্দোলনকারীদের। এই ঘটনার পর আল-জাযিরা 'কী সাবই সিনীন' নামে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করে। যেখানে দেখানো হয়, অনেক ইসলামপন্থী সরকারি প্রহসন ও জেল-জুলুম সহ্য করতে না পেরে ইসলাম ছেড়ে দিচ্ছে, আল্লাহর সাহায্য থেকে হতাশ হয়ে সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়ছে কিংবা অনেকেই বাম ও সেক্যুলার রাজনীতিতে যোগদান করছে।

নাস্তিকতা, সন্দেহ ও সংশয় রোধে পরিবারই হলো সবচেয়ে বড়ো দুর্গ। সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম যে পন্থা অবলম্বন করবেন সেটি হলো, কুরআনি দীক্ষা। তখন ষড়যন্ত্রকারীর শত চক্রান্তও তাদেরকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।
প্রথমত নিজেকে, এরপর সন্তানসহ অন্যান্য সকলকে এই কথার ওপর গড়ে তুলুন যে, আমাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য।

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“যিনি মরণ ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য।”

এটাই হলো বাস্তবতা। পরীক্ষা করার জন্য। তাদের ভালোভাবে আরও শিক্ষা দিন :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ الشَّاكِرِين* َ

“আর মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তাঁর পূর্বেও বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? বস্তুত যদি কেউ উলটো ফিরে যায়, তবে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের পুরস্কৃত করবেন।

সন্তানদের বলুন, ‘প্রিয় বৎস, মহান আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা না করেই সফলতা দেবেন এমন বলেননি বরং পরীক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِين(۝

“আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্ট করার মাধ্যমে। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।”

তাদের বলে দিন,

لتيلون في أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أفركوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۝

“অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধনসম্পদে ও জীবনে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের আগে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের কাছ থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনতে পাবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং খোদাভীতি অবলম্বন করো তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ

তাই প্রিয় ছেলে, যখন আমাদের রব আমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন, তখন ধৈর্য হারিয়ে তার ওপর প্রশ্ন তুলবে না।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخَسْرَانُ الْمُبِين(۝

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিপতিত হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন ইবাদতের ওপর অটল থাকে কিন্তু যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তৎক্ষণাৎ পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত তো সে-ই। আর এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।”

সন্তানকে বলুন। ‘ছেলে আমার, খবরদার, তোমার ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়ায় আশা করবে না। দুনিয়া হলো পরীক্ষার স্থান, প্রতিদান প্রাপ্তির নয়।

وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“কেবল কিয়ামাতের দিনেই তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান পূর্ণ মাত্রায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে।”

তাদের এই কথা বলতে যাবেন না যে, ‘সালাত পড়লে আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ভালো নাম্বার দেবেন। সদাকা ও যাকাত পরিপূর্ণরূপে আদায় করো, এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্পদের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করবেন।' এসব না বলে বরং তাকে এই কথা বলুন যে, সালাত পড়লে আল্লাহ খুশি হবেন। হতে পারে সালাত পড়ার পরও আল্লাহ তোমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন, কিন্তু জেনে রেখো, আল্লাহ তোমার সাথেই থাকবেন।'

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ

“ওহে বৎস, সালাত কায়েম রাখো, সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দকাজের নিষেধ করো এবং তোমার ওপর নেমে আসা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো।”

শত্রুর অত্যাচারের মুখে সে যেন হতাশ হয়ে না পড়ে। আপনার সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন,

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

“আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের মাধ্যমে পরীক্ষা করতে চান।”

তাকে এই কথার ওপর গড়ে তুলুন,

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ
“আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ বানিয়েছি। দেখি, তোমরা সবর করো কি না?”

তাকে এও বলুন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
“হে মুমিনগণ, তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই ওপর। যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও তবে পথভ্রষ্ট কেউ তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না।”

সন্তানদের হৃদয়ে ইসলামের জন্য আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করুন। যখন সে ইসলামের কোনো ক্ষতি হতে দেখবে যেন সাথে সাথে জ্বলে ওঠে, কেউ ইসলামের পতাকা ভূলুণ্ঠিত করতে চাইলে যে যেন নিজ দায়িত্বে বীরদর্পে এগিয়ে আসে। তাদেরকে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوا أَنْصَارَ اللهِ
“হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও।”

তাদেরকে সেসব ব্যক্তির মতো তৈরি করুন যাদের ব্যাপারে কুরআনে এসেছে

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل

“এদেরকে লোকেরা বলেছিল, ‘তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জড়ো হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো'। কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল, ‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই-না উত্তম অভিভাবক!

তাদেরকে ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তা শিক্ষা দিন। জালিমের অত্যাচার যাদের ঈমানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে। তাদের সামনে সেসব মুমিনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করুন যাদেরকে তাদের ঈমানের কারণে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, অথচ আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ
“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝরনাসমূহ। আর এটাই তো মহাসাফল্য।”

মানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তবু আল্লাহ তাদের সফল বলে আখ্যা দিয়েছেন। কারণ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল, শেষ সময় পর্যন্ত দৃঢ় থেকেছিল।
সন্তানদের এই শিক্ষা দিন, যেন তারা এতসব যন্ত্রণা সহ্য করেও সুখী থাকে। কারণ তাদের জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। সন্তানকে বলুন, “প্রিয় বৎস, আল্লাহ দুনিয়া প্রত্যেককেই দেন। পছন্দের-অপছন্দের সকলকেই। কিন্তু ঈমান শুধু তাদেরকেই দেন যাদের তিনি ভালোবাসেন। যদি তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল -কে ভালোবাসো তা হলে ভেবে নেবে আল্লাহ তাআলা তোমাকে পছন্দ করেন। এরপর থেকে তোমার যা কিছুই হবে সবই তোমার কল্যাণে।

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ
“বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্য দুটি মঙ্গলের কোনো একটির অপেক্ষাই করছো। ”

অর্থাৎ আমাদের সাথে যা-ই ঘটুক না কেন উভয়টি কল্যাণ ও মঙ্গলের। হয়তো আমরা বিজয়ী হব না হয় প্রভুর সন্তুষ্টির পথে শাহাদাত বরণ করব। এই দুই কল্যাণকর পরিণতি ছাড়া আমাদের আর কী-ইবা ঘটবে?!

আখিরাতের সাথে সন্তানদের সম্পর্ককে মজবুত করুন। এই আয়াতটি তাদের দেখিয়ে দিন,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"

উপসংহার

যখন দেখা যাবে, সন্তানরা নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী একজন দায়িত্বশীল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হয়ে বেড়ে উঠেছে, তখন বুঝতে হবে—সন্তান লালন-পালনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। মুসলিম যুবকদের শুধু পরিবার ও সমাজের প্রতিই দায়িত্ব নেই; বরং বৃহৎ মুসলিম উম্মাহ এবং পুরো মানবজাতির প্রতিও তাদের দায়িত্ব রয়েছে। যে সকল পিতা-মাতা সন্তানদের শিক্ষিত করতে এবং মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য তাদের লক্ষ্যে স্থির থাকেন, তারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেন।
আধুনিক সময়ে তরুণ সমাজকে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন এবং প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে পথ দেখানো খুবই চ্যালেঞ্জিং একটি ব্যাপার।

বর্তমান উদাসীনতাপূর্ণ, ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন এবং আত্মতৃপ্তির ও অহংবোধে পরিপূর্ণ বিশ্বে সমাজের মৌলিক কল্যাণার্থে সামগ্রিক প্রচেষ্টার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু ইসলামের সফলতা উম্মাহর ঐক্যের মধ্যে নিহিত। কুরআনে আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে থাকার এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
‘তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো এবং দলাদলি করো না।' সূরা আলে ইমরান : ১০৩

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের মাঝে সমাজের জন্য কাজ করার আগ্রহ ও অনুভূতি তৈরি করা। আমার যখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই সকল কাজে অংশগ্রহণ করি, তখন আমাদের সন্তানরা স্বাভাবিকভাবেই এগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ।

বর্তমান সংখ্যার বিচারে মুসলিম উম্মাহ অনেক বড়ো, কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাদের প্রভাব কতটুকু? বিশ্বকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর দুঃসাহসী প্রচেষ্টা শুরু

করার সময় কয়জন মুসলিম ছিল? সংখ্যা যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ইসলামি শক্তি তার অনুসারীদের যোগ্যতার দ্বারাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো—উম্মাহকে আবার পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পিভাবে কাজ করা। বর্তমান সময়ে জন্য এমন কিছু মুসলিম প্রয়োজন, যারা স্বেচ্ছায় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, যাদের মধ্যে ইসলামের আদলে মানবতাপূর্ণ সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা রয়েছে। এমন একটি সমাজ—যেটি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা, সমতা ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ।

বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক কারণে এবং মুসলিমদের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশের অনৈসলামিক কার্যকলাপের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এটি সত্য, শত বছরের স্থবিরতা ও অনৈক্যতা কাটিয়ে উঠে বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ নিজদের উন্নতির জন্যে অনেক দৃশ্যমান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিমরা দীর্ঘদিন ধরে আত্ম-অনুসন্ধানে লিপ্ত এবং বর্তমানে তাদের মাঝে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক উন্নতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

অপরদিকে, বস্তুগত উন্নতি এবং বিশাল প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক বিশ্ব বিশাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশা পার করছে, যার ফলাফল সামাজিক দিক দিয়ে খুবই ভয়াবহ। ক্ষমতার ভারসাম্য ধীরে ধীরে পশ্চিমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেউ-ই জানে না পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বিশ্বব্যবস্থা কীরকম হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজে মারাত্মক আকারে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক জায়গায় মানবধিকার লঙ্ঘন এবং নাগরিক স্বাধীনতা হরণ অতি উদ্‌বেগের বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক অস্থিরতাও ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি আমাদের সকলের জন্য পরীক্ষার সময়। সচেতন তরুণ মুসলিমদের উচিত আগ্রহের সাথে এটি পর্যবেক্ষণ এবং অসহিষ্ণুতা ঘৃণামুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় সমাজের অন্যান্য তরুণদের সাথে কাজ করা।